# উপনিবেশ

তৃতীয় পর্ব

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

তৃতীয় পর্ব

# সূর্য স্বপ্ন

## এক

চর ইস্‌মাইল।

চারশো মাইল দূরে বসিয়া আজ স্বপ্ন দেখিতেছি। ছবির মতো মনের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে একটা অপরিণত তটরেখা —নারিকেল আর সুপারীবনের ঠিক নীচেই যেখানে তেঁতুলিয়ার জল মাথা কুটিয়া মরিতেছে। যেখানে বোম্বেটে পর্তুগীজদের শেষ চিহ্নও দিনের পর দিন অবলুপ্ত হইয়া আসিতেছে—জলের তলায় ছয় ফুট উঁচু মানুষগুলির সাদা কঙ্কালের পঞ্জরে জমিতেছে জলজ শৈবাল, মোটা মোটা হাতের রন্ধ্রগুলির মধ্যে কুচো চিংড়িরা নিরাপদ বাসা বাঁধিয়াছে। আর করোটির মাঝখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার আস্তানা—নীল রঙের দাঁড়াগুলি দিয়া তাহারা সন্ধানী বৈজ্ঞানিকের মতো দিগ্বিজয়ী জলদস্যুদের মস্তিষ্কে ছিদ্র করিতেছে। চর ইস্‌মাইলের বর্বর জীবনের উপর দিয়া যেমন করিয়া নামিয়াছে

স্তিমিত আর নিরুত্তেজ সভ্যতা—আর যেমন করিয়া চারশো মাইল দূরের নাগরিক শান্তির নিরাপদ পরিবেষ্টনীতে বসিয়া আমি চর ইস্‌মাইলের গল্প লিখিতেছি। আমারই সিগারেটের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছে চক্রাকারে, নানা সম্ভব অসম্ভব মুখ সেই ধোঁয়ায় রেখায়িত হইয়া উঠিতেছে—ডি-সুজা, ডি-সিল্‌ভা, পোষ্টমাষ্টার—আরো কত কে ?

একটা উপমা মনে পড়িতেছে। ছায়াছবির পর্দায় মৃত্যু-তরঙ্গিত রণক্ষেত্রের ছবি দেখিয়া যেন নিশ্চিন্তে রোমাঞ্চিত হইতেছি। কিন্তু ছায়াছবির আলোকে ছাড়া যাহারা বৃহত্তর জীবনের রূপ দেখিতে পায় না, স্বপ্ন ছাড়া তাহাদের আর সান্ত্বনা কোথায়।

* * *

চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়া দশটা বৎসর কাটিয়া গেল।

আদিম সমাজের গলিত লাক্ষাস্তূপের উপরে আরো ঘন হইয়া নামিতেছে সর্বগ্রাসী মৃত্তিকার আবরণ। জল আর মাটি—জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি যাহারা মূলহীন স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের শিকড় আরো নিবিড় হইয়া মাটির মধ্যে থিতাইয়া বসিয়াছে। পলি মাটি, মাখনের মতো কোমল আর স্নিগ্ধ মাটি—নদীমাতৃক বাংলাদেশের সকরুণ ভালোবাসার মধু নির্যাস দিনের পর দিন বিদ্রোহীদের জীর্ণ করিয়া লইতেছে। রক্তের ফসল নয়—শস্যক্ষেত্রের সোনার ফসল। বোম্বেটে জাহাজের অভিযান স্বপ্ন নয়—আউশ, আমন আর

বোরোধানের কামনা। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মধ্যে অস্পষ্ট রূপ লইয়া যে মানুষগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বাংলাদেশের একটা পরিপূর্ণ রূপ আজ তাহাদের গ্রাস করিয়া লইতেছে।

দশ বৎসর।

পৃথিবী জুড়িয়া জলিয়াছে যুদ্ধের আগুন। আর তাহারি ছোঁয়া লাগিয়া ক্ষুধার আগুন লেলিহ হইয়া শিখা মেলিয়াছে বাংলা দেশে।

দশবৎসর বয়স বাড়িয়াছে বলরাম ভিষকরত্নের। টাকের আশেপাশে স্বল্পাবশিষ্ট চুলগুলিতে সাদার রং ধরিয়াছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়াছে—চোখের দৃষ্টি আসিয়াছে কিছুটা ক্ষীণ হইয়া। গত বছর সহরে গিয়া বলরাম বাঁ চোখের ছানী কাটাইয়া আসিয়াছেন, চশমাও লইয়াছেন। তবু চোখ দিয়া মাঝে মাঝে জল পড়ে, আশংকা হয় দৃষ্টি হয়তো একদিন নিবিয়া যাইবে চিরকালের মতো। ভাবিয়া বলরামের কান্না পায়। সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, সুদূর ফরিদপুরে আত্মীয়-বান্ধব যাহারা আছে, তাহারা যে দুঃসময়ে আসিয়া পাশে দাঁড়াইবে, আশ্রয় দিবে, এমন ভরসাও বড় নাই। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য বলরামের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি—কিছু সুযোগ পাইলেই দু হাতে লুটিয়া পুটিয়া লইবার সাধু-চেষ্টাতে ত্রুটি করিবে না এতটুকুও। তাহাদের প্রতি বলরামের কোন আশা বা বিশ্বাস নাই। মাঝে মাঝে কেমন করিয়া যে এই দূর বিদেশে এতগুলা বৎসর তাঁহার কাটিয়া গেল, ভারী বিস্ময় লাগে সে সব কথা ভাবিতে। আত্মীয়হীন

বান্ধবহীন। নিজের কবিরাজী, ধান চাল সুপারীর ব্যবসা—মহিষের বাথান, নোনা জলের পুকুর। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব দু চার-জন কি একেবারেই মেলে নাই? মিলিয়াছিল বৈ কি। খাসমহলের যোগেশবাবু, সেই সরকারীবাবু মণিমোহন, আর সেই খেয়াল-ক্ষ্যাপা পোষ্ট মাষ্টারটা—

পোষ্ট মাষ্টার। মনের মধ্যে চমক লাগিল বলরামের। কী অদ্ভুত লোক—কী আশ্চর্যভাবেই বলরাম তাহাকে ভালোবাসিয়া-ছিলেন। কালো কুশ্রী চেহারার মানুষটা, জিলজিলে বুকের চামড়ার নীচে হাড়গুলি যেন উজ্জ্বল হইয়া উঁকি মারে, হাতে গলায় একরাশি তাবিজ। হাঁপানির টান উঠিলে মুমূর্ষু কাত্‌লা মাছের মতো হাঁ করিয়া হাঁপাইত লোকটা। আজ কত দেশ বিদেশই না ঘুরিয়াছে। অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলিত—শুনিয়া কখনো কখনো ভয়ে ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিত বুকের ভিতরটা। কত ঠাট্টাই যে করিত মুক্তোকে লইয়া!

সেই মুক্তো! আবার একটা চমক খাইলেন বলরাম। সমস্ত চেতনার অন্তরাল হইতে উদ্গত হইয়া যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল একটা তীব্র গ্লানি আর বেদনার তরঙ্গে। হাঁ, একদিন বলরাম ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন—নিজের এলো-মেলো, ছত্রিশ ভাবে ছড়াইয়া পড়া জীবনটাকে স্থির ও নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন এক মুক্তোকে কেন্দ্র করিয়াই। কিন্তু কী ফল হইয়াছিল তার? সেই ঝড়ের রাত্রি—সেই অবাঞ্ছিত সন্তান—দু জনের মাঝখানে ভাঙন ধরিল সেই প্রথম। তারপরের দিন-

গুলি ভালো করিয়া মনে পড়ে না, দুঃস্বপ্ন এবং অপমানের রাশি রাশি বিষাক্ত অন্ধকারে সেই সব দিনগুলি যেন ঘনীভূত আর ভারমন্থর হইয়া স্মৃতির উপরে চাপিয়া বসিয়া আছে।

বাঁধিবার আগেই ঘর ভাঙিল। কোথায় গিয়াছে মুক্তো? বলরাম জানেন না। নোনা জল আর নোনা মাটির দেশ, নদী প্রত্যেকদিন নতুন করিয়া পাড় ভাঙিতেছে, নতুন চড়া জাগাইয়া তুলিতেছে দূর দিগন্তে। সেই নদীর ভাঙন একদিন মুক্তোকেও ছিনাইয়া লইয়া গেছে, বলরামের বুকে ভাঙা-পাড়ির মতোই রাখিয়া গেছে খাঁ-খাঁ করা একটা শূন্যতা। চড়ার মতো কোথায় গিয়া যে নতুন ঘর বাঁধিয়াছে মুক্তো বলরাম তাহা জানেন না। জানিবার কৌতূহলও তাঁহার নাই, কেবল—

বলরাম জোর করিয়া ভুলিবার চেষ্টা করিলেন প্রসঙ্গটা। বুকের মধ্যে যে ক্ষত-চিহ্নটা জাগিয়া আছে, কী লাভ সেটাকে আঘাত করিয়া, নিষ্ঠুরভাবে রক্তাক্ত করিয়া। অন্যমনস্ক হইবার আপ্রাণ প্রয়াসে দেওয়ালের দিকে তাকাইলেন বলরাম। সমস্ত ঘরটার চেহারাই বদলাইয়া গেছে বিস্ময়করভাবে। দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা প্রায় দুবৎসর যাবৎ স্তব্ধ হইয়া আছে—চলে না। কাচের উপর ধুলা জমিয়াছে, মাকড়সারা জাল বাঁধিয়াছে কায়েমী-স্বত্বের মতো। দেওয়ালের গায়ে গ্রুপ ফোটোগ্রাফখানির একটি মানুষকেও আর চিনিতে পারা যায় না। সেই রঙীন চীনা ছবি-গুলি কবে ধূলার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেছে—শুধু

গুপ্তপ্রেস কোম্পানীর একখানি দেওয়াল-পঞ্জী দুলিয়া দুলিয়া চর ইস্মাইলের দিনগুলিকে গণিয়া চলিয়াছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলরাম গড়গড়ার নলটা টানিয়া লইলেন। রাধানাথ ধরাইয়া দিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ আগেই, বলরামের খেয়াল ছিল না। বহুক্ষণ ধরিয়া আপনা আপনি পুড়িতে পুড়িতে তামাকটা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। জোরে জোরে গোটা কয়েক ব্যর্থ টান দিয়া বলরাম নলটাকে বিরক্তভাবে দূরে সরাইয়া দিলেন। সময় পাইলে পৃথিবীর যা কিছু এক সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া শত্রুতা সাধে নাকি!

আবার রাধানাথ ঘরে ঢুকিল। দশ বছরেও তেমনিই আছে লোকটা, উল্লেখযোগ্যভাবে এমন কিছুই বদলায় নাই। শুধু মাথার চুলগুলি এখানে ওখানে বিশৃঙ্খলভাবে এক একটি শাদা গুচ্ছে পাকিয়া উঠিয়াছে, যেন কেউ এক রাশ খড়ির গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়াছে। চোখের দৃষ্টি তেমনি কৌতুক আর ধূর্ততায় উজ্জ্বল, শুধু চোখদুইটার নীচে চামড়ায় দুই:তিনটা করিয়া ভাঁজ পড়িয়াছে মাত্র।

রাধানাথ আসিয়া কহিল, বাবু?

—কী খবর?

—কালুপাড়ার মজাঃফর মিঞা দেখা করতে এসেছে।

বলরাম নিজের মধ্যে, বর্তমানের মধ্যে যেন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিলেন। মনের সামনে হইতে যেন খানিকটা দুঃস্বপ্নের কুয়াশা আকস্মিক ভাবে মিলাইয়া গেল। বলরাম বলিলেন, ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

মজাঃফর মিঞা একটা লাঠি ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মণিমোহনের* সেই মজাঃফর, বেহেস্তনিবাসী আস্রাফ্ মিঞার পুত্র। বয়স এখন সত্তরের সীমা ডিঙাইয়াছে। মেহেদী রাঙানো দাড়ির বাহার আর নাই, অবিমিশ্র শুভ্রতা বুক পর্যন্ত নামিয়াছে। আর সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে না সে; চলিতে চলিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করে, হাতপাগুলি কাঁপিতে থাকে শিশুর মতো অক্ষম অসহায়তায়। হাতের মধ্যে কম্পিত লাঠিটা মেজেতে বাধিয়া থট্ থট্ শব্দ হইতেছে, মুখটা নাড়িতেছে অনবরত, মনে হয় গালের মধ্যে কী একটা পুরিয়া দিয়া সে আপ্রাণ চেষ্টায় সেটাকে চুষিয়া চলিয়াছে।

বলরাম বলিলেন, বোসো মিঞাসায়েব, বোসো।

লাঠির উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া, বাঁকা পিঠটাকে অতি কষ্টে সোজা করিয়া অষ্টাবক্র ভঙ্গিতে মজাঃফর মিঞা আসন গ্রহণ করিল। বলিল, আদাব। কিন্তু দন্তহীন মুখের ভিতর হইতে শব্দটা স্পষ্ট ফুটিয়া বাহির হইল না—খানিকটা অর্থহীন ধ্বনির রূপ লইল শুধু। অভ্যস্ত কান বলিয়াই বলরাম মজাঃফর মিঞার কথাগুলি বুঝিতে পারেন; সাধারণ লোকের কাছে সেগুলি আত্মপ্রকাশের খানিকটা জৈবিক কাকুতি ছাড়া আর কিছুই নয়—অনেকটা বোবার মর্মান্তিক বো-বো করার মতো।

বলরাম ভালো করিয়া একবার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন মজাঃফর মিঞার। প্রথমেই চোখে পড়িল অশোভন আকারের সুদীর্ঘ পায়ের পাতা দুইটার দিকে। বাদুড়ের ডানার

মতো কালো কালো কুঞ্চিত চামড়া—ক্ষয় হইয়া আসা নখগুলির আগায় আগায় লাল মাটি শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। গায়ের ময়লা জামাটা হইতে রসুন আর ঘামের একটা মিশ্রিত দুর্গন্ধ উঠিয়া আসিয়া ঘরটাকে ভরিয়া দিল।

বলরাম বলিলেন, ব্যাপার কী মিঞাসাহেব ?

—ধানের দর তো খুব চড়েছে। এই বেলা সব বিক্রী করে দেব নাকি ?

—কত চড়েছে ?

—পনেরো।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলরাম চিন্তা করিলেন খানিকক্ষণ। এবারের ধানগুলি যেন লক্ষ্মীর হাতের ছোঁয়া বহিয়া আসিয়াছে। দর বাড়িতেছে—অবিশ্রান্ত আর অবিশ্বাস্তভাবে বাড়িয়া চলিতেছে। গোলার মহাজনেরা প্রত্যেকদিন নতুন দর দিতেছে, চাহিদার আর বিরাম নাই। বাহিরের পৃথিবীতে কী যে ঘটিতেছে বলরাম তাহা ভালো করিয়া জানেন না, খবরের কাগজ মাঝে মাঝে কিসের যে বার্তা লইয়া আসে, তাহাও খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে না তাঁহার কাছে। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি গ্রাহক, তাহাতে আরও দশটা খবরের সঙ্গে বলরাম জানিতে পারিয়াছেন—পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। আর একেবারে যুদ্ধটা কেবল সুদূর ইংলণ্ড আর জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই, তাহার তরঙ্গটা ভারতবর্ষের কূল-উপকূলেও আসিয়া ঘা মারিয়াছে। বর্মা নাকি বেদখল হইয়া গিয়াছে—কলিকাতায় বোমা পড়িতেছে।

চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়াই আজকাল পাখীর মতো ডানা মেলিয়া দিয়া সারে সারে বিমান উড়িয়া যায়—গুরু-গর্জনে চর ইস্‌মাইলের নারিকেল আর সুপারীর বন চমকিয়া মর্মরিত হইয়া ওঠে। যুদ্ধ বাধিয়াছে বই কি। তেল পাওয়া যায় না, লবণ পাওয়া যায় না, কাপড়ের জোড়া দুই টাকা হইতে ছয় টাকায় উঠিয়াছে। চারিদিকে কিসের একটা সুনিশ্চিত সংকেত। দূরের নদী দিয়া সৈন্যবাহী ষ্টিমার চলিয়া যায়—ইহাও বলরামের চোখে পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে অত্যন্ত ভয় করে, যেন অনাগত বিপদের একটা মহাকায় কৃষ্ণচ্ছায়া সমস্ত চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে ধানের দর। অসম্ভব-ভাবে বাড়িতেছে—অশুভভাবে বাড়িতেছে। বলরামের অচেতন মন হইতে কী একটা যেন সাড়া দিয়া বলে এ লক্ষণ ভালো নয়; এ যেন মরিবার আগে সান্নিপাতিক জ্বরের রোগীর হঠাৎ ভালো হইয়া ওঠা—নিভিবার পূর্বে প্রদীপের একটা আকস্মিক অগ্নিময় অন্তিম উচ্ছ্বাস।

বলরামের চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া মজঃফর মিঞা প্রশ্ন করিল, কী করা যাবে বাবু?

অভিনিবেশ সহকারে আবার খানিকটা ধূমপান করিয়া লইলেন বলরাম। ভয়টাকে অতিক্রম করিয়া ঘরের মধ্যে লোভ আসিয়া উঁকি মারিতেছে। যাহা হইবার তাহা পরে হইবে, আপাতত সেজন্য আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছু লাভ নাই।

আরো কিছুদিন দেখাই যাক না। ধান উঠিতে না উঠিতেই এই—গোটা বর্ষাকাল তো এখনো সম্মুখেই পড়িয়া আছে। ধৈর্য কিছুটা ধারণ করাই ভালো, ভবিষ্যতে অন্তত ঠকিতে হইবে না।

বলরাম বলিলেন, যাক না আর ক'দিন ?

মজঃফর মিঞা যেন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইল—বলরামের কথাটা যেন তার ভালো লাগিল না। কম্পিত আঙুলগুলিতে দাড়িটা আঁচড়াইয়া লইল একবার—নখের খড়ি-ওড়া দাগ টানিয়া টানিয়া চুলকাইয়া লইল বাদুড়ের ডানার মতো কালো কালো পা দুখানা। তারপর বলিল, কিন্তু কাজটা বোধ হয় ভালো হচ্ছে না বাবু। যাদের ক্ষেত-খামার আছে তাদের ভাবনা নেই, কিন্তু মুস্কিলে পড়েছে জন-মজুর আর ছোট ছোট আধিয়ারেরা। চালের দর এত বাড়লে ওরা খায় কী। তা ছাড়া শুনলাম জেলেরা নাকি এর মধ্যেই উপোস করতে সুরু করেছে। এমন চললে দেশে যে আকাল দেখা দেবে।

বলরাম উষ্ণ হইয়া কহিলেন, তার আমরা কি করব ? আমরা তো দর বাড়াই নি। এখন অল্প দামে যদি গোলা খুলে সব ছেড়ে দিই, তা-হলে শেষ নাগাদ নির্ঘাত পস্তাতে হবে এ তোমাকে বলে রাখলাম বড় মিঞা। তা ছাড়া অসুবিধে কি আমাদের নেই ? তেল, নুন, চিনি কিছু পাওয়া যায় না—যা মেলে তার দাম পাঁচ-গুণ। কিছু বেশি পয়সা যদি না পাই, তা হলে কী খেয়ে বাঁচব বলতে পারো ?

—তা ঠিক। কিছুক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল মজঃফর মিঞা।

বলরামের প্রজা সে, তাঁহারই জোত-জমার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং কর্তার ইচ্ছার উপরে কথা কহিয়া লাভ নাই, সে ক্ষেত্রে তাহার নিজের স্বার্থও জড়াইয়া আছে। যা দিন আসিতেছে, কিছুই তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

আর এই তো, এতখানি বয়স হইল মজঃফর মিঞার। কিন্তু এবারের মতো এখন একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তি সে আর কোনোদিন অনুভব করে নাই। গতবার যে লড়াই লাগিয়াছিল —সেও খুব বেশিদিনের কথা নয়, তাহার বড় নাতির বয়স হইবে—তখনকার কথা তাহার ভালো করিয়াই মনে আছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছিল, ধান-চালের দর বাড়িয়াছিল। কিন্তু এবারের মতো এমন একটা অশুভ সম্ভাবনা যেন আসিয়া দেখা দেয় নাই। এবারে কলিকাতায় বোমা পড়িয়াছে, মাথার উপর দিয়া বিমান উড়িয়া যায়, ধরণ-ধারণ সব কিছুই আলাদা। কাজেই আগে হইতে হুঁশিয়ার থাকা ভালো—যা পাওয়া যায় দুই হাতে কুড়াইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! কী হইবে জেলে আর জন-মজুরদের জন্ম দুর্ভাবনা করিয়া? যাহার কপালে যাহা আছে তাই ঘটিবে—মাঝে হইতে নিজের ফাঁক পড়িলে কোনো লাভ নাই।

মজঃফর মিঞা জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে?

—তা হলে আর কি। যাক আরো কটা দিন।

তবুও মজঃফর মিঞা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল: জমিরকে চেনেন বাবু, জমির?

—কে জমির? কাসেম খাঁর ব্যাটা?

—হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। বাঁদির বাচ্ছা বড় গোলমাল সুরু করেছে।

—গোলমাল? বলরাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন: কিসের গোলমাল?

—ভয় দেখাচ্ছে। বলছে এখন ধান চাল সব ছেড়ে না দিলে লুটপট্ হয়ে যাবে। লোক ক্ষেপে উঠছে—খেতে না পেলে—

তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা উঠিয়া বসিলেন বলরাম: লুটপাট হয়ে যাবে! গায়ের জোরের কথা আর কি! সে সব দিনকাল ছিল দশ বছর আগে, যখন চোত মাস পড়লে আর নৌকো আসত না এ তল্লাটে। এখন সহরে খবর দিলে দু ঘণ্টার মধ্যে ঠাণ্ডা মেরে যাবে সমস্ত। তুমি যাও বড় মিঞা, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, শেষ পর্য্যন্ত আমি তো আছি।

—সেলাম।

লাঠিটায় ভর দিয়া ক্লিষ্ট ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল মজঃফর মিঞা। তারপর খট খট শব্দ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আরো কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দূরে চাহিয়া রহিলেন বলরাম। মজঃফর মিঞার কথা মুছিয়া গেল মন হইতে, মুছিয়া গেল চারিদিকে ঘনাইয়া আসা কী একটা অভিশাপের অনিবার্য সংকেত বাণী। নারিকেল বীথি দুলিতেছে বাতাসে, সুপারীর

সারি চামরের মতো মাথা দুলাইতেছে, নিবিড় নীলিমার বুক জুড়িয়া অভিসার চলিয়াছে লক্ষ্যহীন মেঘের—শরতের শুভ্র হংসবলাকার মতো। নীচের নদীর ধূসর বিস্তারটা আবছায়া হইয়া চোখে পড়িতেছে। এই নদী—ঝড়ো-হাওয়ায় সিংহের মতো গর্জাইয়া ওঠা দুরন্ত নদী! শান্ত হইয়া গিয়াছে—মৃত্যুর মতো ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া নিশ্চুপ মারিয়া পড়িয়া আছে। বছর তিনেক আগে মস্ত বান ডাকিয়াছিল একবার। দৌলত খাঁর বানের পরে এমন ভয়ংকর কাণ্ড আর দেখেন নাই বলরাম। এই চর ইস্‌মাইলের কমসে কম দুশো মানুষ বেমালুম সাবাড় হইয়া গেল, জেলে-পাড়াটাকে মাটির বুক হইতে একেবারে মুছিয়া নিয়াছিল বলিলেই হয়।

সে কী দুঃস্বপ্ন!

মনে পড়িতেই বলরাম আতংকে চমকাইয়া উঠিলেন। কে ভাবিয়াছিল এমন হঠাৎ ওই রকম একটা মৃত্যুর তরঙ্গ আসিয়া সব কিছু ভাসাইয়া দিবে—নিশ্চিন্ত মানুষের উপর প্রলয়ের মূর্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে! সেদিন ভোরে মানুষগুলি টোকা মাথায় পরিয়া যখন জাল লইয়া নামিল, অথবা এক মালাই নৌকা ভাসাইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে দূরের চরে কাজ করিতে গেল, তখন কে জানিত তাহারা আর ফিরিবে না? সেদিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে অল্প অল্প। আর মেঘের ছায়ায় নদীর জল মেঘের রঙ মাখিয়াছে। দিনটা এমনি করিয়াই কাটিল।

তারপর সন্ধ্যা যেই ঘনাইল অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়িতে লাগিল, বাতাস চঞ্চল হইয়া উঠিল, নদীর জল মাতলামি সুরু করিল। তারপরই পূর্ণ মূর্তি ধরিয়া ভাঙিয়া পড়িল সাইক্লোন পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—বাতাসের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া একটা প্রচণ্ড দমকা আসে, চাল উড়াইয়া দেয়, গাছ উপড়াইয়া ছুটিয়া যায় দিগন্তের দিকে। ভয়ার্ত মানুষ কল্পনা করিতে থাকে এইটাই শেষ দমকা, এইবার বুঝি বাতাস মন্দা হইয়া আসিবে। কিন্তু বৃথা আশা—বিলীয়মান গোঁ গোঁ শব্দটা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাওয়ার আগেই আবার দূরের নারিকেল বন হাহাকার করিয়া ওঠে, মানুষ চোখ বুজিয়া কান চাপিয়া বসিয়া থাকে—আর একটা। তারপরে আর একটা, আরো একটা—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কত মানুষ যে ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, তাহার হিসাব কে রাখে।

কিন্তু দেবতার অনুগ্রহ ওইখানেই থামিলে তবু কথা ছিল! রাত তখন কয়টা হইবে বলরামের খেয়াল নাই, হয়তো দুইটা। লোকে বলে: নদীর দিক হইতে অমানুষিক ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া আকাশটাতে যেন চিড় ফেলিয়া দিয়া গর্জন করিল বরিশাল গান। দক্ষিণের দিগন্তটা একটা বিচিত্র অগ্নিলেখায় মুহূর্তে ঝলকাইয়া উঠিল। তারপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশটাতে হাজার হাজার ফেনার শুঁড় ছোঁয়াইয়া হাজার হাজার পাগলা হাতীর মতো ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে 'শরের' জল ছুটিয়া আসিল। কোথায় রহিল নদীর কূল, কোথায় বা রহিল গ্রাম, কালো আকাশের তলায়

কালো জল যেন বিশ্ব-সংসারকে একেবারে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

উপরে ঝড়—ঘর ভাঙিতেছে, মড় মড় করিয়া গাছ নামিতেছে মাথার উপরে; নীচে বন্যা—দশহাত প্রমাণ জলোচ্ছ্বাস মানুষকে ভাসাইবার জন্য কল্পনাতীত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। চর ইস্‌মাইল কিছুটা উঁচু—এদিকের ভদ্রপাড়া পর্যন্ত সে জলটা পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু নীচের দিকে বন্যা কোনোকিছুকে এতটুকুও ক্ষমা করিল না। দুদিন পরে যখন জল নামিল, তখন দেখা গেল হাজিয়া-যাওয়া ধানক্ষেতের রাশি রাশি কাদার মধ্যে ঢোলের মতো ফুলিয়া আছে মরা গোরু, মাথাভাঙা সুপারী গাছের আগায় বিকট-গন্ধ গলিত মানুষের দেহ আটকাইয়া আছে। তারপর তিন মাস ধরিয়া চলিল রিলিফ, চলিল কত কী। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মধ্যে কতগুলা অমানুষিক দুঃস্বপ্নের দিন কাটাইয়া মানুষ আবার সুস্থ আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

কিন্তু এ আবার কী! এ আবার কোন কালযুদ্ধ ঘনাইয়া আসিল! ঝড় নাই, বন্যা নাই, দেবতাদের কোনো নিষ্ঠুর অকৃপা নাই এবারে। বরং অন্যান্য বছর যেমন হয় তেমনিই ক্ষেত ভরিয়া সোনার বরণ ধান ফলিয়াছে। তবু ভয় করে। মনে হয় কিছু একটা ঘটিবে—তেমনি দুর্যোগের মতো—তেমনি ভয়ংকর মৃত্যু-উৎসবের মতো। কিন্তু কী ঘটিবে? বলরাম বুঝিতে পারেন না, কেবল থাকিয়া থাকিয়া সমস্ত চেতনাটা সন্ত্রস্ত আর সংশয়-ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

না, না, ওসব কিছু নয়। কত আশা করিয়া কত স্বপ্ন দিয়া ঘর বাঁধিয়াছে মানুষ। চর ইস্মাইলের বর্বর জীবনের উপর নামিয়াছে মন্থর শান্তি—মধুর বিশ্রান্তি। দশ-পনেরো বছর আগে এরা মারামারি করিত, খুনোখুনি করিত—জমি লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবধি ছিল না। কিন্তু নদী মরিয়াছে, মানুষগুলিও বদলাইয়া গেছে আমূল। এখন দাঙ্গা করিবার আগে গ্রামের লোকে আদালতে মামলা করিতে ছোটে। আগে প্রতিপক্ষকে ল্যাজা দিয়া ফুঁড়িয়া ফেলিয়া লাস নদীর জলে ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হইত, এখন খুনোখুনির আগেই উকীলের পরামর্শ জোগাড় করিয়া আনে। *তিন বছর আগে সেই যে ঝড় হইয়া নদী নিঝুম* মারিয়াছে, তার পর হইতেই একটা যুতসই 'কাইতান' (তরঙ্গ-তাণ্ডব) আজ অবধি চোখে পড়িল না। এমন শান্তির রাজ্যে মানুষ সুখে থাকুক স্বস্তিতে থাকুক, আর দুর্বিপাকে কাজ নাই। বলরাম আবার তাকিয়ায় গা এলাইয়া দিলেন।

ডাকিলেন, রাধানাথ?

বাঁহাত দিয়া মুখটা মুছিতে মুছিতে রাধানাথ অপ্রস্তুতভাবে আসিয়া দেখা দিল। রাঁধিতে রাঁধিতে ঝোলটা চাখিতেছিল সে—ডাক পড়াতে চটপট উঠিয়া আসিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে গোঁফে কিছু ঝোল লাগিয়াছে। হাত দিয়া মুখ মুছিয়া আবার হাতটাকে সে কাপড়ে মুছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলেন না কি, বাবু?

—হাঁ তামাক দে আর একটু। বেরুতে হবে—ওপাড়ার

দিকে রোগী দেখবার তাগিদ। আর কী ম্যালেরিয়াই লেগেছে এবারে, দশ বছরে এমন জ্বর তো দেখি নি এখানে। এবারে জ্বরেই দেশ সাবড়ে যাবে দেখছি।

—আজ্ঞে, মারে কৃষ্ট রাখে কে? আপনি ভেবে আর কী করবেন?—অযাচিতভাবে খানিকটা ধর্মকথা আর সান্ত্বনা বাক্য শোনাইয়া রাধানাথ তামাক আনিতে গেল।

## দুই

ম্যালেরিয়া!

বাস্তবিক এ দুর্গ্রহ যে কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন সে কথা। এই চর ইস্‌মাইল, সমাজ সভ্যতার বাহিরে এই দুর্গম দেশ—এখানে এসব বালাই তো ছিল না কোনকালেই। বিদ্রোহী মানুষ। পাশব বন্যতা, বলিষ্ঠ বর্বরতা—প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর মতো যোগ্যতমের উদ্বর্তন। কিন্তু নতুন পৃথিবী আর নতুন মাটি পুরানো হইয়া আসিল—নোনাধরা জমিতে ক্রমে পলিমাটির মিঠা ছোঁয়াচ লাগিয়া শস্যের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। বাহু বাড়াইতে লাগিল সভ্যতা, আর তাহারি সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তাহার ব্যাধিগুলিও যেন এখানকার জীবনের বিষ ছড়াইতে লাগিল—ঘুণ ধরাইয়া দিল। নদী মরিয়াছে—নানা কৌশলে সরীসৃপ গতিতে চড়া এড়াইয়া আর বাঁশের সংকেত

লক্ষ্য করিয়া ষ্টিমারকে পথ চলিতে হয়। আজকাল প্রায় বারো মাসই সহর হইতে নৌকা আসে—যোগাযোগ সরল এবং নির্বোধ হইয়া আসিয়াছে। আর সেই সব নৌকাগুলিতে বোঝাই দিয়া নির্বিঘ্ন শান্তি আর সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া আসিয়া এখানে যেন বসিয়াছে কায়েমি হইয়া।

পর্তুগীজদের বংশধর ডি-সিল্‌ভা ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল। জ্বরের উপর জ্বর আসিয়াছে আবার! সরকারী ডাক্তারখানার পাঁচ-ছয় শিশি ওষুধ গিলিয়াও কোনো লাভ হয় নাই—দশ-বারো দিন হইতে টানা জ্বর চলিতেছে সমানে।

ছেলে ডি-ক্রুজা ওরফে ক্রুজা ডাক্তারখানায় গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া ঠক্ করিয়া শূন্য শিশিটা রাখিল কুলুঙ্গির উপরে। কম্বলের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া কাঁপা গলায় ডি-সিল্‌ভা বলিল, ওষুধ আনলি নে?

ক্রুজা বিরক্ত গলায় বলিল, না।

—না? না কেন? জ্বরে ভুগে ভুগে মরে যাব নাকি?

—আমি কী করব?

—আমি কী করব! তার মানে? জ্বরের উপরে ক্রুদ্ধ ডি-সিল্‌ভার মাথার রক্ত চড়িয়া গেল, উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে এখনি বেয়াদব ছেলেটাকে ঘা-কতক লাথি মারিত। কিন্তু উপায় যখন নাই, তখন কম্বলের তলা হইতেই যথাসাধ্য গর্জন করিয়া বলিল, ওষুধ আনলি নে কেন বদমাস?

—খালি খালি গাল দিয়ো না। ওষুধ নেই।

—নেই ?

—না। সব শিশিধোয়া জল। কম্পাউণ্ডার বললে, যুদ্ধ লেগেছে, আর ওষুধ আসবে না। চুপচাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকো এখন। আর যদি শিশিধোয়া জলই খেতে চাও তা হলে কষ্ট করে আর ডাক্তারখানায় যেতে হবে কেন ? আমি তিন বাল্‌তি নদীর জল এনে দিচ্ছি, বাড়ীতে যত শিশি বোতল আছে সব তার মধ্যে চুবোও আর খাও।

ছেলেটা দুর্বিনীত আর দুর্মুখ। বছর ষোল-সতেরো বয়স হইয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে না অর্জন করিয়াছে এমন বিদ্যাই নাই। মা মরা ছেলে, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়াই বড় করিয়া তুলিয়াছে ডি-সিল্‌ভা। ফলে যা হইবার তাহাই হইয়াছে—চূড়ান্ত ভাবে বখিয়া গিয়াছে হতভাগা। বাপ যতদিন এমনি পড়িয়া থাকিবে ততদিনই তাহার সুবিধা—সের খানেক ভালো তামাক আছে বাড়ীতে—নিশ্চিন্তভাবে সেইটাই সে টানিয়া টানিয়া শেষ করিয়া দিবে।

অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডি-সিল্‌ভা বলিল, সামনে থেকে দূর হয়ে যা শূয়োরের বাচ্চা।

—নিজেকেই শূয়োর বললে তো ?

—হারামজাদা, উল্লুক গেলি এখান থেকে ?

ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে গালাগালি করলেই কি ওষুধ আসবে নাকি ? এদিকে জ্বরে ভুগছে অথচ গলার জোরে তো কিছু কম্‌তি নেই দেখছি !

শিস্ দিয়া কুব্জা চলিয়া গেল।

ছেলের উপর রাগ করিয়া লাভ নাই। শরীরটা একটু সারিলে হয়—ধরিয়া কিছু লাগাইয়া দিলেই সায়েস্তা হইয়া যাইবে। দোষ যা অদৃষ্টের। তিন বছর ধরিয়া কী দুর্দিনই যে আসিয়াছে। সেই বন্যা—সেই ভয়ংকর দুর্যোগ। রাশি রাশি মানুষ মরিল—ডি-সিল্‌ভার দশ দশটা মহিষ বানের জলে ভাসিয়া গেল। তার পর হইতেই এই চলিতেছে! দুই বছরে তবুও মানুষ যদিবা কিছুটা সামলাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু আবার যুদ্ধ বাধিল, জিনিষপত্রের দাম চড়িল পাঁচগুণ। সর্বোপরি বিষফোঁড়ার মতো দেখা দিল ম্যালেরিয়া। মানুষ দাঁড়াইবে কোনখানে?

চিৎ হইয়া ডি-সিল্‌ভা উপরের চালটার দিকে চাহিল। টিনের এখানে ওখানে বড় বড় ছিদ্র দেখা দিয়াছে, তাহারি ভিতর দিয়া সূর্যালোক যেন একটা সোনার টুকরার মতো ঘরের মেজেয় আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। রোদের আলোকে চালের এখানে ওখানে সিল্কের মতো উজ্জ্বল হইয়া চিক্ চিক্ করিতেছে মাকড়-শার জাল। বর্ষা নামিলেই ওখানকার রন্ধ্রপথগুলি দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িবে। সারাইবার উপায় নাই। করোগেটেড্ টিন পাওয়াই যায় না, যাও বা পাওয়া যায় তাহার দাম এম্‌নি আগুন যে ঘর সারাইতে গেলে ঘর-বাড়ী নীলামে চড়াইতে হয়। সব টিন যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। অতএব যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত চালটা সারানোর কথা কল্পনাই করা চলে না—অবশ্য ততদিন বাঁচিয়া থাকিলে তবেই।

আচ্ছা : একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডি-সিল্‌ভা ভাবিতে লাগিল : টিন দিয়া কী হয় যুদ্ধে ? বন্দুক, কামান না তরোয়াল ? টিনের তরোয়াল দিয়া মানুষের কি গলা কাটিয়া ফেলা যায় ? মাথার উপর দিয়া যে-সব এরোপ্লেন উড়িয়া যায় ওগুলি কিসের তৈরী ? কে জানে ?

পায়ের দিক হইতে বরফের মতোই একটা শীতলতা সমস্ত শরীরের মধ্যে শির্‌ শির্‌ করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। হৃৎপিণ্ড দুই-টাতে সজোরে কাঁপুনি জাগাইয়া সেই ঠাণ্ডাটা গলায় আসিয়া পৌঁছিল। দাঁতে দাঁত বাজিতেছে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া। জ্বরটা একটু কমিয়াছিল—আবার বাড়িল। একটা অসহায় নিশ্বাস ফেলিয়া কম্বলের মধ্যে আত্মগোপন করিল ডি-সিল্‌ভা। সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপাইতে কাঁপাইতে ম্যালেরিয়ার তরঙ্গ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল—ডি-সিল্‌ভা মূর্ছিতের মতো পড়িয়া রহিল।

চোখের সামনে এলোমেলো ছায়ার মতো কী কতগুলা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে সে। কোথায় যেন ভয়ংকর যুদ্ধ চলিতেছে একটা। কিন্তু এটা কেমন যুদ্ধ ? ভারী বিস্ময় লাগিল ডি-সিল্‌ভার। কামান, বন্দুক, এরোপ্লেন কিছু নয়—খালি ঝন ঝন করিয়া শব্দ হইতেছে। চোখ মেলিয়া সে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল কতকগুলা করোগেটেড্‌ টিন। হাত পা কিছু নাই—কিন্তু কী যেন একটা মন্ত্রবলে তাহারা সবাই অদ্ভুতভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রখর রৌদ্রে টিনগুলা জ্বলিতেছে, তাহাদের দিকে তাকাইতে গেলে চোখে ধাঁধাঁ লাগে। একটা টিন আর একটার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—যেটা পড়িল সেটা আবার লাফ মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে—ধূলায় যেন দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দড়াম করিয়া বিকট শব্দে কি একটা ফাটিয়া গেল—বুকের মধ্যে চমক' দিয়া উঠিল ডি-সিল্‌ভার। হাওয়ায় পাখা মেলিয়া ওগুলি কী উড়িতেছে? একটা নয়, দুইটা নয়, একশো, দুশো, হাজার! কুইনাইনের পিল নাকি? হ্যাঁ—আশ্চর্য ব্যাপার, কুইনাইনের পিলই তো বটে।

বিকারের ঘোরে ডি-সিল্‌ভা খেয়াল দেখিতে লাগিল।

*

কিন্তু জুজাকে সে যতটা অকৃতজ্ঞ আর পিতৃভক্তিহীন ভাবিয়াছিল আসলে সে তাহা নয়। মুখে যাহাই বলুক, জুজা বাপকে ভালোবাসে। পথে বাহির হইতেই বলরামের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে এবং বাপকে দেখাইবার জন্য টানিয়া লইয়া আসিয়াছে তাঁহাকে।

বলরাম ডি-সিল্‌ভার বিছানার পাশে আসিয়া বসিলেন। নাড়ী দেখিলেন অনেকক্ষণ। ময়লা গেঞ্জীর উপরে কাঠের একটা ষ্টেথিস্‌কোপ লাগাইয়া হৃদস্পন্দনটা পরীক্ষা করিলেন। কবিরাজী করিলেও কিছু কিছু আধুনিকতা বলরামের আছে। তারপরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জ্বর ছাড়ে?

জুজা খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিল, বোধ হয় না।

—বোধ হয় না? বেশ ছেলে যা হোক। বাপের জন্ম ছাড়ে কী না সে খবরটাও নিতে পারো নি?

লজ্জিত হইয়া জুজা মাথা নীচু করিয়া রহিল।

—কি খাচ্ছে?

—মুরগীর ঝোল।

সর্বনাশ!—বলরাম শিহরিয়া উঠিলেন: এত জ্বরের ওপর মুরগীর ঝোল খাচ্ছে! মরে যাবে যে! কেন, সাবু খাওয়াতে পারো না?

—কোথায় পাওয়া যাবে?

কোথায় পাওয়া যাইবে? সে কথা ঠিক। কিছুই তো পাওয়া যায় না। আরো বিশেষ করিয়া সাবু। এ বস্তুটাও যে সময় বিশেষে সোনার দানা হইয়া উঠিতে পারে, এমন কথা কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল কেউ? মহাজন আর দোকানদারেরা তো ব্রেক হাত গুটাইয়া বসিয়াছে। চাউলের দাম বাড়িয়াছে—চিনি পাওয়া যায় না, কেরোসিন মেলে না, ডাল বাজারে নাই। জীবনধারণের সমস্ত জিনিসগুলিই যখন দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেছে, তখন সাবুদানার জন্ম দুশ্চিন্তা করিবার মতো মাথাব্যথা কাহারো নাই।

কিন্তু অত কথা ভাবিতে গেলে তো আর ডাক্তার কবিরাজের চলে না। পৃথিবীর উপরে চটিতে গিয়া বলরাম জুজার উপরেই চটিয়া উঠিলেন।

—জোগাড় করো যেখান থেকে হোক। এতবড় ছেলে হয়েছ, এতটুকু করতে পারো না বাপের জন্যে।

একটা বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া কুজা বলিল, আচ্ছা।

—আর ওষুধ। একটা পাঁচন দেব—তৈরী করে রাখব দুপুরবেলা। আর মুরগীর ঝোলটোল খাইয়ো না, তা হলে কিন্তু বাপের চোখ উল্টে যাবে। মনে থাকে যেন।

বিবর্ণ মুখে কুজা আবার বলিল, আচ্ছা।

বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। মস্তবড় একটা কাজ আছে হাতে —দেরী করিলে চলিবে না। কাল এখানে সস্ত্রীক আসিয়াছেন সহরের সার্কেল অফিসার। ডাক-বাংলোতে বাসা বাঁধিয়াছেন। তাঁহার শরীরটা নাকি একটু খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাঁহাকে একবার দেখিয়া আসিবার জন্ত তিনি লোক পাঠাইয়া বলরামকে খবর দিয়াছেন। মনে মনে গর্বিত বোধ করিয়াছেন বলরাম। তাঁহার কদর বাড়িয়াছে এখন, সাহেব-সুবোরা এখানে আসিলেও তাঁহার ডাক পড়ে আজকাল। আর না পড়িয়াও উপায় নাই। সরকারী ডাক্তারখানা আছে বটে, কিন্তু সেখানকার নতুন গোঁফওঠা ছোক্‌রা ডাক্তারকে লোকে বড় আমল দিতে চায় না—তাঁহার প্রবীণ অভিজ্ঞতাকেই বিশ্বাস করে বেশি।

নদীর ধার দিয়া বলরাম হাঁটিয়া চলিলেন। একটু দূরেই সার্কেল অফিসারের শাদা বোটখানা বাঁধা। শান্ত আকাশে গাং চিল উড়িতেছে—মাছরাঙারা ঝপাং ঝপাং করিয়া ছোঁ মারিতেছে জলে। পর্তুগীজদের বিলুপ্ত গীর্জাটার ওখানে খাড়া বাড়ির চূর্ণ-বিচূর্ণ বুকের মধ্যে নারিকেলের শিকড় নিরবলম্ব হইয়া দুলিতেছে।

ইলিশ মাছের নৌকা দূরে দূরে ভাসিতেছে মন্থর গতিতে—বেড়াজালের কালো কালো খুঁটিগুলি জলের বুকে অনেকটা জুড়িয়া কতগুলা মানুষের মাথার মতো বৃত্তাকারে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিতেছে।

নদীর তীর ছাড়াইয়া আর একটু আগাতেই লাল ইঁটের তৈরী সরকারী ডাক-বাংলো। একটা উঁচু টিলার উপরে চমৎকার সুন্দর বাড়িটা—বহুদূর হইতেই চোখে পড়ে। বছর দুই আগে মাত্র তৈরী হইয়াছে বাড়িটা—এখনো নতুন। দ্বিধা-কম্পিত পায়ে বলরাম আগাইতে লাগিলেন।

বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়া সাহেব খবরের কাগজ পড়িতেছেন। কাগজের বিপুল ব্যাসের অন্তরালে মুখটা ঢাকা। খাকী প্যান্টের নীচের দুখানা কালো কালো পা দেখা গেল—যাক, বদমেজাজী গোরাচাঁদ নয় তাহা হইলে। খানিকটা নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন বলরাম।

ডাকিলেন, হুজুর?

সাহেব মুখের উপর হইতে খবরের কাগজ সরাইয়া হাসিলেন। নমস্কার করিয়া কহিলেন, আসুন, আসুন, কবিরাজমশাই। চিনতে পারলেন?

বলরাম হকচকিয়া গেলেন। উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিলেন, কই, আমি তো—

—কী আশ্চর্য, ভুলে গেলেন এরই মধ্যে। হাকিম প্রাণ

খোলা ভাবে হাসিয়া উঠিলেন : আপনার চেহারা তো প্রায় একই রকম আছে, আমি দেখেই চিনেছি। কিন্তু আমি কি এর মধ্যে এতই বদলে গেলাম নাকি। সেই খাসমহল কাছারীর তশীল-দার মণিমোহন বাঁড়ুয্যেকে ভুলে গেলেন! আমি[illegible]ণিমোহন।

—তাই তো, তাই তো। বিস্ফারিতদৃষ্টিতে বলরা[illegible] চাহিয়াই রহিলেন।

## তিন

বিস্ময়ের ভাবটা কিছু পরিমাণে কাটিলে আত্মস্থ হইয়া বলরাম বসিলেন। খাসমহল কাছারীর সেই তরুণ তহশীলদার মণি-মোহনই বটে। এতটা আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জীবনটা ঘুরিয়া চলিয়াছে চক্রবৎ গতিতে—মণিমোহনেরও পদো[illegible]তি হইয়াছে। বলরামের মনটা অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উ[illegible]। আহা, উন্নতি হোক, সব দিক দিয়াই উন্নতি হোক। বড় [illegible]লো ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একটা অবচেতন গর্বের অনুভূতি আসিয়া তাঁহাকে দোলা দিয়া গেল। মণিমোহন—সাধারণের চোখে আজ সে হাকিম, অসংখ্য লোকের দণ্ডমুণ্ডের সে বিধাতা। কিন্তু বলরামের কাছে দশবছর আগেকার সেই ছেলেমানুষ সরকারী বাবুটি ঠিক তেমনিই রহিয়া গিয়াছে—এতটুকু ইতর-বিশেষ হয় নাই, একবিন্দু রূপান্তর ঘটে নাই। কেশী কংসজয়ী সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও কি যশোদা এমনি করিয়াই ভাবিতেন?

প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখে বলরাম মণিমোহনের দিকে নির্নিমেষ ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

—কবিরাজমশাই, একটু চা খাবেন নাকি।

বলরাম ভাবিতে লাগিলেন—হাঁ, বয়স একটু বাড়িয়াছে বইকি মণিমোহনের। গলার আওয়াজটা বেশ গভীর আর গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে—জাঁদরেল একটা হাকিম হইতে গেলে যা দরকার হয়। গায়ের রঙ্ আরো একটু কালো হইয়াছে—লাবণ্য শুকাইয়া গিয়া যেন একটা রুক্ষ বাস্তবতার ছাপ পড়িয়াছে। সর্বাঙ্গে চোখের দৃষ্টিতে আজ যেন খানিকটা দাম্ভিকতা আর আলস্যের স্তিমিত ছায়া; অথচ সেদিন এই চোখ দুটি মধ্যে মধ্যে যেন স্বপ্নের ঘোরে পিছাইয়া পড়িত, শাণিত বুদ্ধিতে চিক চিক করিত। হাঁ, বয়স নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে মণিমোহনের। একটা দশাসই দস্তুর মাফিক হাকিম হইতে গেলে যা দরকার, সবই।

—কবিরাজমশাই, একটু চা করতে বলি?

কবিরাজ ভাবনার অতলতা হইতে ভাসিয়া উঠিলেন। গর্বে গৌরবে মনটা ভরিয়া উঠিতেছে। বড় ভালো ছেলে মণিমোহন। এতদিন পরে, এতটা বড় হইয়াও তাঁহাকে কেমন মনে রাখিয়াছে, আদর অভ্যর্থনা করিতে এতটুকু ত্রুটি নাই কোথাও। বলিলেন, চা? না, চা তো বিশেষ—

—খান না এক পেয়ালা। চায়ের মতো কী আর জিনিষ আছে? গ্রীষ্মকালের শীতল পানীয়, আর শীতের দিনে গরম

পানীয়—বিজ্ঞাপনে পড়েন নি? আপনার মৃত-সঞ্জীবনী সুরার চাইতে অনেক বেশি ফলদায়ক, কী বলেন?

—যা বলেছেন।

ভারী খুশি হইয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন। মাথার তৈল-মসৃণ সুডোল ইন্দ্রলুপ্তটির উপরে রোদের একটি ফালি পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল; বলরাম যদি গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য-সামন্তেরা আনায়াসেই মনে করিতে পারিত যে একটা অশরীরী জ্যোতির্ময়তা বলরামের মাথা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে বাহিরে।

—ওরে, দু পেয়ালা চা দিয়ে যাস্ এখানে—হাঁকিয়া চাকরকে বলিয়া দিল মণিমোহন। সত্যিই হুকুম করিবার মতো গলার আওয়াজটা বটে। পদ-মর্যাদার চাপে যথোচিত ভারিক্কী আর গুরুভার যে হইয়া উঠিয়াছে, এ সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় পোষণ করিবার কারণ নাই কোনোদিক হইতে। সেদিনের তরলোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর দশ বছর আগেকার খরস্রোতা তেঁতুলিয়ার জল-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কালের দিগন্তে ভাসিয়া গেছে। তা যাক, সবই তো যায়, কিছুই কাহারো জন্যে অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকে না। কত লোকই তো এমন করিয়া চলিয়া গেল। সেই ডি-সুজা—বাঘের মতো দুঃসাহসী মানুষটা; সেই হরিদাস—যাযাবর, আপনভোলা একটা বিশৃঙ্খল মানুষ; সেই জোহান—বর্মীরা যাহার গলা কাটিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল; সেই লিলি—যাহার শোকে পাগল হইয়া গিয়াছিল ডি-সুজা; সেই মুক্তো—

নামটা মনে করিতেই বলরাম আবার চমকিয়া উঠিলেন মুখের উপর বেদনার কতগুলি রেখা বিকীর্ণ হইয়া গেল নিজের অজ্ঞাতেই। দশবছর সময়টা কি এতই দীর্ঘ দুরান্তব্যাপী? যদি তাহাই হয়, তবে এতদিনে কেন সেই দুঃস্বপ্নটাকে তিনি ভুলিতে পারিলেন না? কেন এখনো মুক্তোর কথাটা বুকের মধ্যে আঘাত করিয়া করিয়া তাঁহাকে এমন ভাবে রক্তাক্ত করিয়া দেয়?

—তারপরে কবিরাজমশাই, দেশের খবর কী আপনাদের?

কবিরাজ আপদমস্তক শিহরিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মণিমোহন মুক্তোর কথাটা ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে নাকি? কিন্তু মুক্তো সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু একটা সে তো জানিত বলিয়া মনে পড়ে না। তবু অপরাধী মনে আশংকাটা সময়ে উদ্যত হইয়া আছে—ব্যথার জায়গাটাতে পাছে ঘা লাগিয়া বসে, সেই জন্য সদাসর্বদা সেটাকে দুহাতে আগলাইয়া রা৷িতে চান বলরাম।

—অ্যাঁ, খবর? কী খবর জিজ্ঞেস করছিলেন?

মণিমোহন খবরের কাগজটা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে প্রশ্ন করিয়াছিল—কিছু একটা জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই। তাই বলরামের এই চমকটা তাহার চোখে পড়িল না। একটা কোণে দৃষ্টি রাখিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, এই দেশের গাঁয়ের।

—ওঃ। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন বলরাম: দেশের খবর তো নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। ধান-চালের বাজার বড় খারাপ। তা ছাড়া ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া এসেছে এবারে। দশবছর

আগে তো লোকে এসব বালাইয়ের কথা ভাবতেই পারে নি। হালে দু চারটে করে জ্বরে ধরেছিল বটে, কিন্তু এবারে একেবারে মড়কের মতো জাঁকিয়ে বসেছে।

—লোক মরছে নাকি ?

—মরেছেই তো দু দশটা। এক জেলে পাড়াতেই তিন চারটে সাবড়ে গেল কদিনের মধ্যে।

—হুঁ, কুইনাইন আসছে না।—গম্ভীর মুখে কাগজটা ভাঁজ করিয়া পাশের টিপয়টার উপর নামাইয়া রাখিল মণিমোহন : ওষুধ-বিষুধের চালান সব বন্ধ। যা যুদ্ধ লেগেছে।

—যা বলেছেন, যুদ্ধ!—আগ্রহে বলরামের চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে কৌতূহলী মনের খোরাকটা পুরোপুরি মিটিতে চায় না—লোভ বাড়াইয়া দেয়। সাগ্রহে বলরাম বলিলেন : এই যুদ্ধই যত গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আচ্ছা, যুদ্ধের ব্যাপারটা কী, বলুন তো ? জার্মানী এবার লড়াই জিতে নেবে, তাই নয় ?

—কী বললেন, জার্মানী লড়াই জিতে নেবে ?—মণিমোহন হাসিয়া বলরামের দিকে তাকাইল : খবরদার, ও সব কথা আর ভুলেও মুখ দিয়ে বের করবেন না কোনোদিন। যুদ্ধের সময়, কোন্ দিকে যে কার কান খাড়া হয়ে আছে ঠিক নেই। গভর্ণমেণ্ট এ সব কথা জানতে পারলে আপনাকে ডিফেন্স্ অফ ইণ্ডিয়া আইনে ধরে নিয়ে যাবে।

সর্বনাশ! সভয়ে বলরাম বলিলেন, না, না, ও সব কথা

আমি বলতে যাব কেন। কী দরকারটা পড়েছে আমার। ওরা সব আলোচনা করছিল—

—ওরা কারা?

মণিমোহন অনেকটা যেন থমকাইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি কঠোর হইয়া আসিল খানিকটা। বলরাম আবার অনুভব করিলেন মণিমোহন এখন অনেকটা বদলাইয়া গেছে, আজ অনেকটা দূরত্ব রাখিয়া এবং অনেকখানি সতর্ক হইয়াই কথা বলিতে হইবে তাহার সঙ্গে। গর্ব ও আনন্দের যে তরঙ্গটা একটু আগেই মনের মধ্যে উছলাইয়া উঠিতেছিল, মুহূর্তে সেটা স্তিমিত সংকোচে শান্ত হইয়া আসিল।

জ্যোতির্ময় টাকটা একটুখানি চুলকাইয়া লইয়া বলরাম কহিলেন, এই খাসমহলের যোগেশবাবু, হালদার মিঞা, গালু বিশ্বাস—

—নিষেধ করে দেবেন, সবাইকে নিষেধ করে দেবেন। সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে, তাই না? শুধু জেনে রাখবেন আমরা জিতছি, আমরা জিতবই। বেশি কৌতূহল ভালো নয়, সময় বিশেষে সেটা দস্তুরমতো মারাত্মকও হয়ে উঠতে পারে—জানেন তো?

মণিমোহন আবার বলরামের দিকে চাহিয়া হাসিল। কিন্তু এবারে তাহার হাসিটা আর তেমন করিয়া বলরামের ভালো লাগিল না। কোথায় কী একটা যেন খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে একটা অকারণ বেদনার বোঝায় সমস্ত মনটা ভারী হইয়া রহিল।

—যা বলেছেন।

বলরামের তরফ হইতে হাসিবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে সমস্ত মনটা। যে দিনগুলি যায় তাহারা আর ফিরিয়া আসে না নতুন করিয়া। কাল বদলায়, পৃথিবী বদলায়। চর পড়িয়া তেঁতুলিয়ার উদ্দাম করাল স্রোত মন্থর হইয়া আসে। সেদিনের সেই তরুণ শান্ত মণিমোহন আজ রাশভারী একটা হাকিম হইয়া ফিরিয়াছে চর ইস্মাইলে।

চা আসিল।

মণিমোহন একটা পেয়ালা আগাইয়া দিয়া কহিল, খান কবিরাজমশাই।

সোনালি ফুল-কাটা পেয়ালাটায় সোনালি রঙের চা কবিরাজ মুখের সামনে তুলিয়া লইলেন। অত্যন্ত গরম। খানিকটা চা ডিসে ঢালিয়া লইয়া বলরাম এক মনে চুমুক দিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন শুধু এই জন্যেই তিনি এখানে আসিয়াছেন—হাকিমের সঙ্গে বসিয়া এক পেয়ালা চা খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই তাঁহার নাই। সোনালি পেয়ালার সোনালি চা-টা বেশ ভালো লাগিতেছে, ঘরের মধ্যে জমিয়া থাকা অস্বস্তির বোঝাটা যেন সরিয়া যাইতেছে একটু একটু করিয়া।

মণিমোহন বলিল, হাঁ, যে জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার স্ত্রীর ভারী সখ, এই সব নদী নালার দেশে একটু বেড়িয়ে যাবেন। তাই তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে

এসেছিলাম। কিন্তু কী বিভ্রাট দেখুন, পথে আসতে আসতেই ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়েছেন। আপনি একটু দেখে যান তাঁকে। ডাক্তারখানায় খবর পাঠিয়েছিলাম, ওষুধ-বিষুধ কিছু নেই সেখানে। মহা মুস্কিলেই পড়া গেছে। আপনার কথা শুনে তো আরো বেশি ভয় ধরে গেল। আপনি একটু দেখুন দিকি।

—বেশ তো—চায়ের ডিসে শেষ চুমুক দিয়া বলরাম বলিলেন, বেশ তো।

চাকরটা সামনেই দাঁড়াইয়া ছিল। মণিমোহন বলিলেন, মেমসাহেবকে তৈরী হতে বল, কবিরাজমশাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন ভেতরে।

মেমসাহেব! আর একটা অপরিচিত শব্দ বলরামের কানে আঘাত করিল। চাকরটা চলিয়া গেল খবর দিতে।

বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্বরটা বেশি নাকি?

—না, তেমন বেশি নয়। তবে যা দিনকাল—বোঝেন তো।

—তা তো বটেই।

চাকর আসিয়া জানাইল মেমসায়েব তৈরী হইয়াই আছেন, কবিরাজমশাই স্বচ্ছন্দে ভেতরে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতে পারেন। মণিমোহন কহিল, চলুন। সংশয়গ্রস্ত পা দুইটাকে টানিয়া বলরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরের মধ্যে একখানা ডেক-চেয়ারে গলা পর্যন্ত শাল টানিয়া দিয়া মেমসায়েব চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। বছর পঁচিশ

করিয়া কবিরাজ বাহির হইয়া পড়িলেন : বিকেলেই আবার না হয় খবর নেবো এসে।

মণিমোহনও কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা বাহির হইয়া আসিল।

—আচ্ছা কবিরাজমশাই !

—বলুন !

—এখানকার পোষ্ট মাষ্টারটিকে মনে নেই আপনার ? সেই যে কী রকম একটা পাগল লোক—কী নাম ?

—হরিদাস সাহা।

—হাঁ, হাঁ, হরিদাস সাহা। এখানে আছেন তিনি ?

—নাঃ।—বলরাম একটা দৃষ্টি মেলিয়া আকাশের দিকে তাকাইলেন। উজ্জ্বল নীল আকাশে সাদা মেঘ যাযাবরের মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অমনি করিয়াই একদিন দূর-বিস্তৃত পৃথিবীর উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে কোন শূন্য দিগন্তে মিলাইয়া গেছে ? হরিদাস। বলরাম আবার বলিলেন, নাঃ অনেকদিন আগেই চলে গেছে।

—বেশ লোকটা ছিল, তাই নয় ? ভারী অদ্ভুত লোক।

—হুঁ।—হরিদাসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যেন বলরামের ভালো লাগিতেছে না। অত্যন্ত অকারণে মনটা ব্যথাতুর আর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে—ওই যোগাযোগে বড় বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে মুক্তোকে—বড় বেশি করিয়া যন্ত্রণা জাগাইয়া তুলিতেছে দশ বৎসরের পুরোণো ক্ষতটাকে।

বলরাম বলিলেন, তা হলে আমি যাই। অনেক কাজ আছে। চার দিকে জ্বর—ব্যারামের জন্যে ডাকের আর কামাই নেই কি না।

—আচ্ছা আসুন। বিকেলে মনে করে একবারটি খবর দেবেন কিন্তু। আর একটা কথা। নাঃ, থাক, আসুন আপনি।

টাকের উপরে রোদ্রের আলোটা জ্বালা করিতেছে। ছাতাটা খুলিবার জন্য দাঁড়াইতেই বলরামের কানে ভাসিয়া আসিল মায়ের গলায় সস্নেহ তিরস্কার: ছিঃ ঝিণ্টু, এখন কোলে উঠবার জন্যে দুষ্টুমি করতে নেই। আর ওই ভদ্রলোকের সামনে কী অভদ্র ভাবে তুমি চকোলেট খাচ্ছিলে বলো তো? উনি কী যে ভাবলেন—

পলকের জন্যে কী একটা অর্থহীন আকর্ষণে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার দ্বিগুণ বেগে চলিতে সুরু করিলেন বলরাম। এ একটা স্বতন্ত্র জীবন—এ একটা প্রেম এবং আনন্দের নতুন অমৃত লোক। এখানে বলরামের অধিকার নাই, এই স্বর্গ হইতে তিনি নির্বাসিত। কিন্তু কেন? কেন এমন হইল? কেন আজ রাধানাথকে আশ্রয় করিয়া নিঃসঙ্গ দিন তাঁহাকে কাটাইতে হয়? মরিয়া গেলে মুখে একটুখানি আগুন ছোঁয়াইবে এমন লোকও তো আশে পাশে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এ অধিকার হইতে কে তাঁহাকে বঞ্চিত করিল। ইচ্ছা করিলে একটার জায়গাতে তিনটা বিবাহ অত্যন্ত অনায়াসেই কি তিনি করিতে পারিতেন না? আর তাহা হইলে এমনি করিয়াই তাঁহার ঘর ভরিয়া সন্তান দেখা দিত, এমনি করিয়াই সব কিছু—

—কিন্তু! কিন্তু বলরাম আলেয়ার পেছনে ছুটিয়াছিলেন। ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন মিথ্যার উপরে। তাহার শাস্তি তিনি পাইয়াছেন, ভালো করিয়াই পাইয়াছেন। এই শূন্যতা, এই নিঃসঙ্গতা, এই তাঁহারই অপরিহার্য কর্ম্মফল। অকস্মাৎ নিজের উপরে একটা সুতীব্র অর্থহীন বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হইয়া গেল বলরামের মনটা। দ্রুতবেগে তিনি চলিতে লাগিলেন—অনেকগুলি রোগী পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, এ সব অবান্তর ভাবনায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সময় কাটাইলে তাঁহার চলিবে না।

আর ওদিকে মণিমোহনও তাঁহার গন্তব্য-পথের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

একটা কথা তাহার মনে পড়িতেছিল, ভাবিতেছিল একবার বলরামকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয় ব্যাপারটা। কিন্তু প্রশ্ন করিতে গিয়াই খেয়াল হইল সে সব বলরামের জানিবার কথা নয়। কিন্তু কথাটাকে ভোলা যাইতেছে না কিছুতেই।

সে কি ভুলিবার। দশ বছর আগেকার কথা—কিন্তু মনের দিকে চাহিলে মনে হয়, এই তো সেদিন। কষ্টিপাথরে সোনার দাগ পড়িয়া যেমন জল্ জল্ করিতে থাকে, তেমনি করিয়া স্মৃতি-বিস্মৃতির পটভূমিকার উপরে সেই লেখাটা ক্ষয়হীন দীপ্তিতে উজ্জল হইয়া আছে।

…সেই ঝড়ের রাত্রি। দুটি নীলার মতো চোখ হইতে বিষাক্ত কামনার আলো যেন ছুরির ফলার মতো বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। বাহিরে গর্জ্জন করিতেছে ঝড়! ধূলার ঘূর্ণিতে বাগানটা

অন্ধকার হইয়া গেল। মড় মড় শব্দ করিয়া কী একটা ভাঙিয়া পড়িল—একখানা ডাল, অথবা আস্তো গাছই একটা। তার ঝাপ্‌টায় জানালার পাল্লা দুইটা হতাশভাবে বারে বারে আছড়াইয়া পড়িতেছে। বড় বড় ফোঁটায় শব্দ করিয়া ডানায় বৃষ্টি উড়িয়া আসিতেছে—চড়বড় চড়বড়—যেন একদল ঘোড়সওয়ার আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ছুটিয়া গেল। তারপর দুইটা কঠিন আর কোমল বাহুবন্ধন—সাপের আলিঙ্গনের মতো। চুলের গন্ধটা ক্লোরোফর্মের কাজ করিয়া তাহাকে যেন ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়াছিল। ছোরা দেখাইয়া সেদিন সেই ভালোবাসা আদায় করিয়া নেওয়া। প্রেম নয়—কামনা। সুধা নয়—মদিরা।

তারপরে আর একটি রাত। সেদিনকার সেই বিজয়িনীই সেই রাত্রে আসিয়াছিল আশ্রয়ার্থিনী হইয়া। বোটের মধ্যে আরো অন্ধকার। নীচে নদীর জল যেন কল কল করিয়া কাঁদিতেছে—কোথায় চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল নিশাচর পাখী। হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে মেয়েটি, তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না, চেনাও যায় না। অসংলগ্ন মন লইয়া সেদিন কত কী ভাবিয়াছিল মণিমোহন—কত কী বলিয়াছিল। নিজের জীবনের সঙ্গে ওই বিচিত্ররূপা বিদেশিনীকে সে জড়াইয়া লইতে চাহিয়াছিল একান্ত করিয়া। কিন্তু মেয়েটি কর্ণপাত করে নাই সে কথায়। অন্ধকারের মধ্যে যেমন রহস্যময়ী হইয়া সে দেখা দিয়াছিল, তেমনি রহস্যময়ীর মতোই মিলাইয়া গেছে।

*যদি সেদিন সে রাজী হইয়া যাইত মণিমোহনের প্রস্তাবে?* যদি সেদিন সত্যিই বাস্তবীরূপে আসিয়া তাহার জীবনকে অধিকার করিয়া বসিত, তাহা হইলে? তাহা হইলে আজকের মণিমোহন সম্পূর্ণ নতুন রূপ লইয়া দেখা দিত। সংগ্রাম আসিত, সংঘাত আসিত। কর্মজীবনের ধারা উল্টা দিকে বহিত, বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইত কোন্ একটা অনিশ্চয়তার কণ্টকাকীর্ণ অলক্ষ্যে কোথায় যে সে ভাসিয়া যাইত কে জানে। তার চাইতে এই তো ভালো। উন্নতির বাঁধা পথ—জীবনের সুনিশ্চিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিসমাপ্তি।

ঘরের মধ্যে ঝিণ্টু হাসিতেছে—রাণী হাসিতেছে। সুখের জীবন, পরিতৃপ্তির জীবন। এই ভালো, এই ভালো। রাণী সুখী হইয়াছে, সে সুখী হইয়াছে, সবাই সুখী হইয়াছে।

সে সুখী হইয়াছে?

*এই নদীর দেশ—প্রাগৈতিহাসিক দেশ। এখানে আসিয়া* মনের সুরটা যেন অন্যভাবে বাজিয়া উঠিতে চায়। সৃষ্টিছাড়া দেশে আসিয়া সৃষ্টির নিয়মটাকে যেন বদলাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। ভালোমন্দের সংজ্ঞাটা নতুন করিয়া বিচার করিতে ইচ্ছা হয় একবার।

# মণিমোহনের ডায়েরী হইতে

"বহুদিন পরে ডায়েরীর পাতা খুলিলাম।

মলাটের উপরে ধূলা জমিয়াছে, পাতাগুলির রঙ ক্রমশ হলদে হইয়া আসিয়াছে। লিখিতে গেলে অক্ষরগুলি জাবড়াইয়া যায়। যেন বলিতে চায়, ওর কাজ ফুরাইয়াছে, এতদিন পরে আবার ওকে আলোতে টানিয়া আনা ওর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের উপরে খানিকটা উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই নয়। মনটাও আজ কিছু ভাবিতে চায় না—নিরুত্তাপ ও নিরুত্তেজ শান্তিতে ঝিমাইয়া পড়িতে চায়—মনের প্রতিলিপিও বুঝি তেমনি করিয়া মুছিয়া যাইতে চায় স্মৃতির পাণ্ডুলিপি হইতে। যা গিয়াছে, তাহাকে যাইতে দাও। যে তুমি আজ আর বাঁচিয়া নাই, নতুন করিয়া ডায়েরী লিখিতে বলিলেই কি আজ আবার তাহাকে পুনর্জীবন দিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? কোন লাভ হইবে না, কেবল অনর্থক হতাশায় ভরিয়া যাইবে সমস্ত।

ডায়েরীর পাতা খুলিয়া লেখাগুলি পড়িতেছি। সেই আমি, পশ্চাতের আমি। কত কল্পনা, কত আশা, কত আত্মবিশ্লেষণ। এই ডায়েরীর পাতার নিজের মধ্যে যেন একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলাম। সেই জগতে আমি স্রষ্টা, আমি সর্বময়, সেখানে আমার একচ্ছত্র রাজত্ব। কত সহস্র রূপে নিজেকে বিচার করিয়াছি, রচনা করিয়াছি, ভাঙিয়া ফেলিয়াছি। সেই আমি কি এই? আজ আমার সমস্ত কিছু সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত

হয়েছে। বৃহত্তর ভাবনা নাই, মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মনের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রয়াস নাই। আমার মধ্যে সেদিন কত অসংখ্য কাহিনীর নায়ককে পাইয়াছিলাম, কত অগণ্য সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেদিনের আমি আজ কী হইয়া দাঁড়াইয়াছি ভাবিতে ভয় পাই। জীবনের এই নির্দিষ্ট গতিপথ ছাড়া চলার যে আর কোনো দিক আছে, এটা কল্পনা করিতেই মন আতংক এবং আশংকাগ্রস্ত হইয়া ওঠে।

মপার্সাঁর একটা উপদেশ মনে পড়িতেছে: No man should read his old letters; পুরানো চিঠি পড়িলে একান্ত সার্থক জীবনকেও মূল্যহীন এবং মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, সমগ্রব্যাপী একটা শোচনীয় ব্যর্থতার সুস্পষ্ট রূপ তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় আত্মহত্যার পথে। কিন্তু আত্মহত্যা আমি করিব না—অতখানি মনোবিলাস বা মনের প্রবণতা আমার নাই। শুধু পিছনে ফেলিয়া আসা জীবনটার দিকে চাহিয়া কৌতূহল আর বিস্ময়বোধ হইতেছে। আমি কী হইতে পারিতাম—কী হইয়াছি।

কেন এত সব কথা মনে পড়িল? মনে পড়িল এই চর ইস্‌মাইলে আসিয়া। জীবনের সব চাইতে মূল্যবান অভিজ্ঞতা আর সব চাইতে বিস্ময়কর অনুভূতি আমি এখানেই লাভ করিয়াছি। সেই মেয়েটি—সেই বর্মী মেয়েটি। নাম ভুলিয়া গিয়াছি। কী হইবে তাহার নাম দিয়া? সে যেন এখানকার আদিম প্রকৃতির মূর্ত প্রতীক। এখানকার ঝড় আর হিংস্র সৌন্দর্যের উচ্ছল তরঙ্গ লইয়া আমাকে গ্রাস করিয়াছিল, আবার তেমনিভাবেই রিক্ত গম্ভীর

ঔদাসীন্যে আমাকে পিছনে ফেলিয়া সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। •

কী হইত সেদিনের স্রোতে ভাসিয়া পড়িলে? কী হইত সেদিন সেই বন্য সৌন্দর্যের করাল গ্রাসে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিলে? পশ্চাতের আমি লোভ দেখাইতেছে। বলিতেছে: তাহা হইলে সহস্র সংঘাতের মধ্য দিয়া তুমি বাঁচিয়া থাকিতে—নিজেকে সহস্র সত্তায় বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিতে, অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া সার্থক হইতে পারিতে। এমন করিয়া জীবনের একমুখী আলস্য মন্থরগতির মধ্য দিয়া তোমার সমস্ত সত্তার মৃত্যু ঘটিত না।

না, না, এভাবে নিজেকে লোভ দেখাইয়া লাভ নাই। দশবছর বয়স বাড়িয়াছে, পদোন্নতি হইয়াছে, উন্নতির শীর্ষ শিখর তো এখন সম্মুখেই পড়িয়া। তা ছাড়া পাশেই রাণী ঘুমাইতেছে। ওর শান্ত কোমল মুখের উপরে আলো পড়িয়া অপরূপ শ্রীতে ওকে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ও যেন পূর্ণ বিশ্রাম—সমস্ত সংগ্রাম ও ক্লান্তির একান্ত শান্তিময় অবসান। নীড় আর ভালোবাসা। ঝিণ্টুর মুখখানা ওর মায়ের বুকের মধ্যে লুকাইয়া আছে। আমার সন্তান আমার সজীব-দেহ ও মনের ধারাবাহক। এই ভালো। যা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি পথের ধূলাতেই তাহার শেষ চিহ্নটুকু মিলাইয়া যাক। চর ইস্‌মাইল আজ আর আমার রক্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না—তাহার ডাকিনীমন্ত্রকে আমি জয় করিয়াছি।"

# চার

চর ইস্‌মাইলের বাহিরে বৃহত্তর পৃথিবী ঘুরিয়া চলিয়াছে।

দিগ্‌ দিগন্ত জুড়িয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মানচিত্রে রেখাগুলি প্রত্যেকদিন বদলাইয়া চলিয়াছে নূতন করিয়া—ইয়োরোপে, চীনে, প্রশান্ত মহাসাগরে, ভারতবর্ষে। চর ইস্‌মাইল কি তাহার স্পর্শ পায় নাই? পাইয়াছে বই কি। মাথার উপর দিয়া বিমান ওড়ে—নদীর জলে ফেনিল তরঙ্গ জাগাইয়া সৈন্যবাহী জাহাজ ভাসিয়া যায়। ভারত মহাসাগরে জাপানী মানোয়ার হানা দিয়া ফিরিতেছে। বর্মা, আরাকান শত্রুপক্ষ গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। আসামের সীমান্তে কামান গর্জন—খাসিয়া, জয়ন্তী, লুসাই পাহাড়ের চূড়াগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কাঁপিয়া উঠিতেছে। চট্টগ্রামে বোমা পড়িতেছে।

উন্মাদ ডি-সুজাকে লইয়া গিয়াছিল গঞ্জালেস্। লিসিকে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবে—উদ্ধার করিবে। যেমন করিয়া হোক্, যতদিনেই হোক্। কতটুকু এই পৃথিবী, কতখানিই বা এই মহাসাগরের ব্যাস? তাহাদের দিগ্বিজয়ী জলদস্যু পূর্বপুরুষেরা একদিন সাতটি সাগর চষিয়া বেড়াইত, তাহাদের ড্রাগন আঁকা রক্তপতাকা সমুদ্রের নীল জলে রক্তের ছায়া ফেলিত। সন্ধান সুরু হইল। চট্টগ্রাম হইতে আরাকান খুব বেশি দিনের পথ নয়—ডি-সুজাকে লইয়া গঞ্জালেস্ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইল সমস্ত। কিন্তু লিসির সন্ধান পাওয়া গেল না—না পাওয়া গেল বর্মীদের

কাহাকেও। তারপর একদিন সকালে উঠিয়া গঞ্জালেস্ দেখিল ঘরের চালে একটা দড়ি ঝুলাইয়া তাহার সঙ্গে ডি-সুজাও ঝুলিতেছে। গলাটা সারসের গলার মতো লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মানুষের জিভ যে অতখানি বড় হইতে পারে, এর আগে সেটা কোনোদিন কল্পনাই করিতে পারে নাই গঞ্জালেস্। নাকের ফাঁক দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িয়া বুকের উপরে কালো হইয়া জমিয়া আছে। আত্মহত্যা করিয়াছে ডি-সুজা। এতবড় বীর, এমন দুঃসাহসী পুরুষ। তাহার অমিত শক্তিমান জীবনকে সে আর কাহারো হাতেই শেষ করিতে দেয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যুকেও মানিয়া লয় নাই। যে আলো সমস্ত জীবন ধরিয়া সে সহস্র ছটায় জ্বালাইয়া দিয়াছিল—নিজের হাতেই সে আলোক সে নিবাইয়া দিয়া গিয়াছে।

তারপরেই ক্রমে কেমন একটা প্রতিক্রিয়া আসিয়া দেখা দিল গঞ্জালেসের মনে। লিসির জন্য সে উদ্দামতাটা যেন আস্তে আস্তে শান্ত হইয়া আসিল। ডি-সুজার মৃত্যুটা একখণ্ড পাথরের মতো হইয়া চাপিয়া বসিল তাহার চেতনায়। মনে হইল, তাহারও শেষ পরিণতি হয়তো বা এমনি করিয়াই ঘনাইয়া আসিবে। তাহার শিরায় শিরায় অতীতের সেই সংস্কারবাদী হিন্দুরক্ত ক্রিয়া করিল।

গঞ্জালেস্ ফিরিয়া আসিল বাড়ীতে।

কাজ কারবারে মন দিল, কিন্তু মন বসিল না। জীবনটা যেন দুইটা ভাগে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেছে। যে বিদ্রোহী বহু দিনের ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, সে কিছুই করিতে পারে না বটে, কিন্তু

আসিতেছে। আরাকানের পাহাড় হইতে তাহাদের কামানের বজ্র গর্জন।

মুহূর্তে পৃথিবীর রঙ বদলাইয়া গেল। সহরে মিলিটারী আসিয়া বাঁধিয়াছে আস্তানা; বিমানধ্বংসী কামানগুলি ডকে, পাহাড়ের টিলায় মাথা উঁচু করিয়া শত্রুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর দিয়া বিমান ঘুরিতেছে চক্রাকারে। এ-আর-পির অসংখ্য সতর্ক বাণী। স্লিট-ট্রেঞ্চের সমারোহ। বাংলার ফ্রন্ট লাইন।

সমস্ত মানুষগুলির মুখ লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। আশা নাই, আনন্দ নাই, একট আতংকের কালো ছায়া আসিয়া ভিড় করিয়াছে সকলের মুখে। যখন তখন তীব্র স্বরে কাঁদিয়া ওঠে সাইরেন। ট্রেনে ষ্টিমারে আশ্রয় লইয়া উর্ধশ্বাসে পলাইতেছে মানুষ। সময় নাই—সময় নাই। তাহারা আসিয়া পড়িল।

সারাটা রাত নেশা করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল গঞ্জালেস্। পেরিয়া আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল।

—এখনো চুপ করে পড়ে আছো যে ?

গঞ্জালেস্ পাশ ফিরিয়া বলিল, কী করতে হবে ?

—প্রাণে বাঁচতে হলে এইবেলাই সরে পড়তে হবে। চাটি বাটি এবারে তোলো।

গঞ্জালেস্ যেন এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিল কথাটা। কেন, কী হয়েছে ?

পেরিয়া চটিয়া উঠিল: হয়েছে মাথা আর মুণ্ডু। আচ্ছা

লোক তো তুমি। ওদিকে যে কী কাণ্ড ঘটেছে খেয়াল নেই বুঝি? জাপানীরা যে এসে পড়ল।

—বেশ তো, আসুক না।

—আসুক না? বিস্ফারিত চোখে পেরিরা বলিল: ভেবেছ কি তুমি? ওরা কি তোমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে আসছে নাকি? বোমা দিয়ে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। শোনোনি, বর্মা যে বেহাত হয়ে গেল। এখনও সময় আছে, চলো—কলকাতার দিকে সরে পড়ি।

—আর কাজ কারবার?

—কাজ কারবার? প্রাণে বাঁচলে ওসব ঢের হবে। এখন মানে মানে তো প্রাণ নিয়ে সরে পড়ো আগে।

—ধ্যাৎ—ধ্যাৎ! অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে গঞ্জালেস্ বলিল, এইজন্যে তুমি আমার নেশাটা চটিয়ে দিলে! যে জাহান্নামে খুসি তুমি যেতে পারো, আমি এখান থেকে নড়ব না।

—মরবার বুদ্ধি হয়েছে, তাই না?

—তাতে তোমার কী? আমি মরলে তো আর তোমাকে চ্যাংদোলা করে কবর দিয়ে আসতে হবে না। যে চুলোয় ইচ্ছে যাও, আমাকে খামকা জ্বালাতন কোরো না।

—বটে বটে? পেরিরা চটিয়া আগুন হইয়া গেল: ভালো কথা বললে মন্দ হয় কিনা। আচ্ছা, তুমি থাকো এখানে। বোমা খেয়ে যদি উড়ে না যাও তো—

—হুইস্কি খেয়ে তো খুব উড়লাম, একবার বোমা খেয়েই দেখি

না—গঞ্জালেস্ বোকার মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিল : একটা নতুন রকমের নেশার স্বাদ অন্তত পাওয়া যাবে। শুনেছি হুইস্কির চাইতে বোমার ঝাঁজটা অনেক বেশি, নয় কি ?

—চুলোয় যাও। তোমার আত্মাটা শয়তানে একেবারেই খেয়ে ফেলেছে দেখছি—পাদরী সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া এবং সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পেরিরা বাহির হইয়া গেল। এমন একটা পাঁড় মাতালের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া তর্ক করা নিছক সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পিছন হইতে গঞ্জালেস্ ডাকিয়া বলিল, পারো তো যাওয়ার আগে বোতল তিনেক হুইস্কি বিদায়ের উপহার দিয়ে যেয়ো বন্ধু। আমার তো ঢের খেয়েছ, এখন—

পেরিরা জবাব দিল না, বাকীটা শুনিবার জন্যে দাঁড়াইলও না। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা নিজের যথাসর্বস্ব গুছাইয়া লইয়া সে কলিকাতার ট্রেণ ধরিল।

কিন্তু গঞ্জালেস্ও আর বেশিদিন নিজের নির্বিকার ঔদাসীন্যের মধ্যে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিল না।

বাহিরের অতি বাস্তব পৃথিবীর স্পর্শও সে অনুভব করিল একদিন। দোকানে গিয়া মদ পাওয়া গেল না—চালান বন্ধ। প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া এক বোতল ধেনো সে সংগ্রহ করিল, তারপর চলিল তাহার প্রিয়তমার সন্ধানে। কিন্তু সেখানে গিয়াও আজ তাহাকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। শুধু তাহার প্রিয়তমাই নয়, সমস্ত ঘরের দরজাই

বন্ধ। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ম যাহারা এই দূর বিদেশের রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে আসিয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনটা সকলের চাইতে বেশি এবং এ ক্ষেত্রেও তাহাদের দাবী অগ্রগণ্য। গঞ্জালেস্ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সব কিছু বিস্বাদ আর নিরর্থক হইয়া গেছে। আজ সে প্রথম অনুভব করিল যুদ্ধ আসিয়াছে—দিকে দিকে তাহারা বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিয়া খানিকটা আগুন জ্বলিয়া গেল। মদের বোতলটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তারপর লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটিয়া চলিল।

যুদ্ধ আসিয়াছে। সমস্ত সহরটা অন্ধকার। শুধু মাথার উপরে অনেকগুলি লাল নীল আলো মৃদু গর্জনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিমান।

গঞ্জালেস্ চলিতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা ল্যাম্প পোষ্টে ধাক্কা খাইল সে, একটা নেড়ী কুকুরের লেজ মাড়াইয়া দিল—কুকুরটা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া সমস্ত শহরটা যেন মাথায় করিয়া তুলিল। তীব্র আলোর জোয়ারে চারিদিক ভাসাইয়া দিয়া ছোটখাটো একটা লোহার ঝড়ের মতো মিলিটারি ট্রাক নক্ষত্রবেগে বাহির হইয়া গেল—একটুর জন্যে চাপা পড়িল না গঞ্জালেস্।

চলিতে চলিতে কখন যে পথ শেষ হইয়া আসিয়াছে সে নিজেও টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন আর আগাইয়া আসিবার উপায় নাই। কালো অন্ধকারের টানা স্রোতের মতো

সামনে কর্ণফুলী বাহিয়া চলিয়াছে অবিশ্রাম কলচ্ছন্দে। হাওয়ায় তীরের নারিকেল বীথি মর্মরিত হইতেছে। অনেক দূরে ডকের একরাশ অস্পষ্ট আলো। জাহাজ নোঙর করিয়া আছে। গঞ্জালেস্ চুপ করিয়া নদীর ধারে বসিয়া রহিল।

সত্যিই যুদ্ধ দেখা দিয়াছে—যুদ্ধ প্রবেশ করিয়াছে রক্তে। কোনোদিক হইতেই তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। সব কিছুতেই সে তাহার দাবী জানাইতেছে নিষ্ঠুর ভাবে, মর্মান্তিক ভাবে। নদীর বাতাসে অনেকদিন পরে যেন গঞ্জালেসের উত্তপ্ত মাথাটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিল। মনে পড়িয়া গেল: গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সহরের পথে দুটি একটি করিয়া মড়া ছড়াইয়া থাকে আজকাল। শুধু মদ নয়, চাল-ডাল-আটা-নুন-তেল সব কিছুই দিনের পর দিন হাওয়া হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। আজ একমাত্র যুদ্ধটাই সত্য এবং তাহার চাইতেও কঠিনতর সত্য যুদ্ধের নির্মম দাবী, অনিবার্য প্রয়োজন।

গঞ্জালেসের চেতনা নিজের মধ্যে নাড়া খাইয়া যেন জাগিয়া উঠিতেছে। এতদিন কোথায় ছিল, কিসের মধ্যে তলাইয়া ছিল সে? সে তো এমন ছিল না। ডেভিড্ গঞ্জালেস্‌কে তাহার মধ্যে কে জাগাইয়া দিল? বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়িল ডি-সুজাকে, মনে পড়িল লিসিকে। ডি সুজা। গলায় দড়ি আঁটিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছিল—তাহার জিভটা দুহাত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। আর লিসি? কোথায় সে? কোন্ সাতসমুদ্রের ওপারে সে চিরদিনের মতো হারাইয়া গেছে?

ঘাসের জমির সামান্য নীচেই কর্ণফুলীর কালো জল কলকল করিয়া বহিতেছে। মৃত্যুর প্রবহমান করাল ধারার মতো কালো। নারিকেল বীথি যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। ওখানে বনের মাথায় খানিকটা রক্ত মাখাইয়া দিল কে? চাঁদ উঠিতেছে নাকি ওখানে? সমস্ত পৃথিবীটা যেন মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

অসহ্য তৃষ্ণায় যেন পুড়িয়া যাইতেছে গলাটা। গঞ্জালেস্ জলের কাছে নামিয়া গেল। আঁচলা আঁচলা করিয়া জল খাইতে সুরু করিল। কী ঠাণ্ডা জলটা—নেশা হয় না, জুড়াইয়া যায় শরীরটা।

হঠাৎ কান্নার মতো একটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক আর্তনাদ উঠিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে সমস্ত শহরটাকে যেন চকিত করিয়া দিল। নদীর জল শিহরিয়া উঠিল। এখানে ওখানে যা দু একটা ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল দপ্ দপ্ করিয়া, অতল অন্ধকারে তাহারা নিবিয়া গেল। বনের প্রান্তে যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল চাঁদটা।

এর আগে আরো অনেকবার বাজিয়াছে, কিন্তু আজকের এই দীর্ঘায়ত অবিশ্রাম কান্নার মধ্যে কিসের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন আছে। গঞ্জালেস্ ঘাসের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া পড়িয়া রহিল নিঃসাড় হইয়া। কতক্ষণ? এক মিনিট, দুই মিনিট, হয়তো বা পাঁচ মিনিট। তারপরেই শোনা গেল দূরের আকাশে এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জন। উপরের তারকা-খচিত পটভূমির নীচে লাল আলোক-বিন্দু দিয়া গড়া একটা তীরের ফলার মতো 'ভি' রচনা করিয়া শত্রু-বিমান উড়িয়া আসিতেছে।

সার্চলাইটের তীব্র আলো আকাশের তামসচক্র উদ্ভাসিত করিয়া

দিল—পাহাড়ের টিলা হইতে গর্জন করিল অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট। অন্ধকারের শূন্যতায় আলোর ফুলঝুরি ছড়াইয়া দিয়া শেল্‌ ফাটিয়া পড়িল। বোঁ-ও-ও। মৌমাছির ঝাঁকটা বাজ পাখীর মতো ছোঁ দিয়া নীচে নামিল, আবার সার্চ লাইটের তীব্র আলো প্রলয়ের বিদ্যুৎ চমকের মতো উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল সমস্ত।

—বুম্‌ বুম্‌—কট্‌-কট্‌-কট্‌—

বিদ্যুৎ চমক—মাথার উপরে আলোকের ফুলঝুরি। অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌ট অবিশ্রান্ত গর্জন করিতেছে। পেটের নীচে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে মাটিটা—যেন মুহূর্তে দু ফাঁক হইয়া গিয়া গোটা শহরটাকেই তলায় টানিয়া লইবে। কর্ণফুলীর জলে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ—অন্ধকারের মধ্যেও দেখা গেল অনেকটা জুড়িয়া একটা শাদা ফেনার বিশাল ঘূর্ণি জলস্তম্ভের মতো দাঁড়াইয়া উঠিল। কট্‌ কট্‌ বুম্‌ বুম্‌। মাটিটা কি চড়্‌ চড়্‌ করিয়া ফাটিতেছে নাকি? হঠাৎ ডকের দিক হইতে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিয়া সব কিছুকে যেন ডুবাইয়া দিল। একটা বিরাট আগুনের শিখা আকাশকে ছড়াইয়া আরো উপরে লক্‌লক্‌ করিয়া উড়িয়া গেল—গঞ্জালেসের চোখের সামনে নামিল মূর্ছার অন্ধকার।

টলিতে টলিতে সে বাড়ি ফিরিল—সে একটা নরকের মধ্য দিয়া। আগুন—রক্ত। ধ্বংসস্তূপ। এই জাপানী বোমা! হুইস্কির চাইতে কড়াই বটে, একটু বেশি পরিমাণেই কড়া। গঞ্জালেসের মতো পাড় মাতালেরও অতটা বরদাস্ত হইবে না।

একবার—দুইবার—তিনবার। শহরে আর মানুষ নাই।

দোকানপাট প্রায় বন্ধ—খাবার মেলে না। চাকরটা পালাইয়া বাঁচিয়াছে। শ্মশানের একটা প্রেতের মতো এভাবে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগে না। গঞ্জালেস্ ভাবিল, এইবারে এখান হইতে সত্যিই সরিয়া পড়া দরকার।

কিন্তু কোথায় যাইবে সে? কলিকাতায়?

না, কলিকাতায় নয়। চোখের সামনে একটা অপরিণত তটরেখা ভাসিয়া উঠিতেছে। যেখানে পর্তুগীজদের ভাঙা গীর্জাটার তলা দিয়া খরস্রোতে নোনা গাঙের জল বহিয়া চলিয়াছে; বালির মধ্যে পুঁতিয়া থাকা লোহার কামান আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনশো বছর আগেকার স্বপ্ন দেখিতেছে; জোয়ার ভাঁটার সন্ধি-ক্ষণে গাঙের জল যেখানে জ্যোৎস্না রাত্রিতে থামিয়া থম্‌থম্ করিতেছে আর তাহার উপর চিত্র-বিচিত্র ডানার ছায়া ফেলিয়া বুনো হাঁসের দল উড়িয়া চলিতেছে—সেইখানে।

সে চর ইস্‌মাইল।

# পাঁচ

খুব ভোরে ওঠাই মণিমোহনের অভ্যাস। আজও যখন তার ঘুম ভাঙিল, ঘড়িতে পাঁচটা বাজে নাই তখনও। কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অনুজ্জ্বল আলো ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকারটাকে যেন সবুজ আর স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। পাশে রাণী ঘুমাইয়া আছে, ঝিণ্টু দু হাত দিয়া একান্ত করিয়া আঁকড়াইয়া আছে মা-কে। রাণীর বিস্রস্ত চুল হইতে একটি স্তবক আসিয়া ঝিণ্টুর নিদ্রিত মুখের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—মায়ের উপর স্পর্শ সুগভীর ভালোবাসার মতো।

এই তো জীবন। পরিপূর্ণ—সমস্যাহীন, সংঘাতহীন। বংশচক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, মানুষের বিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে—বিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে জৈব প্রবাহে। প্রাণ হইতে প্রাণে, রূপ হইতে রূপে। কী প্রয়োজন বিপ্লব ঘটাইয়া, উল্কার আলোকে জীবনে আহ্বান করিয়া? যা কখনো সত্য হইয়া উঠিবে না—একটা প্রখর আলোর বিচ্ছুরিত রশ্মিধারায় জ্বালাইয়া দিয়া যাইবে শুধু?

স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিল মণিমোহন। ভোরের আলোর তন্দ্রাচ্ছন্ন পৃথিবী। চর ইস্‌মাইলের নোনা মাটিতে প্রাণের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই তো পরিণতি। অসীম উন্মুক্ততার যাযাবর বৃত্তি হইতে নীড়ের সংকীর্ণ সীমানাতে—সংঘাত হইতে সন্ধিতে।

রাণী ঘুমাইতেছে—ঝিণ্টু ঘুমাইতেছে। পায়ের কাছ হইতে

র‍্যাগটা তুলিয়া আনিয়া দুজনকেই সযত্নে ঢাকিয়া দিল মণিমোহন। এ পাশের জানালা দিয়া ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। এই ঠাণ্ডাটা ভালো নয়, রাণীর জ্বর আবার বাড়িতে পারে। টেবিলের উপরে ম্লানাভ লাল লেখা বিকীর্ণ করিয়া একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, পোড়া কেরোসিনের লঘু বিস্বাদ গন্ধ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মণিমোহনের লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিল।

পায়ের মধ্যে চটিটা টানিয়া আনিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল সে। আবছায়া আলোয় গ্রাম এবং অরণ্য যেন অবসিত স্বপ্নের রেশ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। সামনের বাব্‌লা গাছটায় দু তিনটা কাক একসঙ্গে পাখা ঝাড়া দিয়া কা কা করিয়া প্রভাতী ঘোষণা করিল, বৈতালিক মুরগীর উদাত্ত আহ্বান ভাসিয়া আসিল গ্রামের দিক হইতে। ওপাশে নদীর উপরে খানিকটা হালকা কুয়াশা জমিয়া আছে, ভালো করিয়া নজর চলে না, শুধু কতগুলি নৌকার দীর্ঘ মাস্তুলকে অনুমান করিয়া লওয়া চলে মাত্র।

বারান্দায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে। ভারী ভালো লাগিতেছে—এই অপূর্ব ব্রাহ্ম মুহূর্তে মনের উপর হইতে সমস্ত দ্বন্দ্ব—সমস্ত সংশয়ের জালটা যেন সরিয়া গিয়াছে। ঝির ঝির করিয়া হাওয়া আসিয়া যেন উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে রাত্রির সমস্ত জড়তা—সমস্ত ক্লান্তি।

একটা দাঁতন করিতে করিতে পিয়ারী দেখা দিল। মণিমোহন বলিল, কোটটা বার করে দে তো, দু পা হেঁটে আসা যাক।

# উপনিবেশ

নদীর ধার দিয়া মেটে পথটায় সে চলিতে লাগিল। একটু একটু করিয়া প্রসন্ন উজ্জ্বল দিন দিগন্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। আকাশের নীলিমা এখনো স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই—ধূসরতার একটা আচ্ছাদন পূর্বাচলকে সমাবৃত করিয়া আছে। তাহারি মধ্য দিয়া উজ্জ্বল রক্ত বিন্দুর মতো সূর্য দেখা দিল—সেদিকে তাকাইয়া মণিমোহনের মনে হইল যেন ভস্মভূষণা গৌরীর সীমান্তে সিন্দুরের একটী বিন্দু জ্বলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন একনিষ্ঠ হইয়া তপস্যা করিতেছে—যেন স্থিরব্রতা পার্বতীর মতো বরাভয় কামনা করিতেছে জীবনের জন্য, কল্যাণের জন্য, সন্তানের জন্য।

পায়ের নীচে ঘাসের উপর শিশির বিন্দু চিক চিক করিতেছে। নদীর গেরি মাটি রাঙা জল লাল হইয়া উঠিল। এক একটি করিয়া নৌকা ভাসিয়া পড়িল—পূবের কোনো চরে কাজ করিতে চলিল হয়তো।

—সেলাম হুজুর।

সামনে একটি মুসলমান যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে একটি কালো ভাঁড়ের মধ্যে খানিকটা দুধ। বলিষ্ঠ বুক, বলিষ্ঠ পেশী। হাতটা আর একবার কপালে তুলিয়া বলিল, হুজুর, সেলাম।

মণিমোহন দাঁড়াইয়া পড়িল।

—কী চাই তোমার?

—একটা কথা বলব হুজুর।

—বলো।

রূপার সিগারেট কেস্‌ বাহির করিয়া মণিমোহন সিগারেট ধরাইল, তারপর লোকটির মুখের দিকে তাকাইল। ঠিক মুখের দিকে নয়—মুখের পাশ দিয়া তির্যক ভঙ্গিতে আকাশের একপ্রান্তে এক খণ্ড শাদা মেঘের দিকে। অধস্তনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার ইহাই আভিজাত্য সম্মত প্রথা—বহুদিনের অভ্যাসে এই আর্টটা মণিমোহন আয়ত্ত করিয়াছে। নীচের দিকে চাহিলে দীনতা, পাশের দিকে তাকাইলে অন্যমনস্কতা, ঠিক মুখোমুখি তাকাইলে একটা অবাঞ্ছিত সাম্যবোধ। অতএব ঠিক কানের পাশ দিয়া এমনভাবে উপরের দিকে চোখ তুলিয়া রাখিবে যে তোমার মুখের পানে চাহিলেই মনে হইবে তুমি নিতান্তই এই পৃথিবীর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নও—তোমার সহিত উর্ধ্বের কোনো একটা স্বর্গলোকের নিবিড় আত্মীয়তা আছে। একজন সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এই সমস্ত মূল্যবান মনস্তাত্বিক এবং দার্শনিক উপদেশ দিয়া মণিমোহনকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করিল—নিজের মনের সংকোচ ও সংশয়টাকে জয় করিবার চেষ্টা করিল বার কয়েক। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলিল, আপনি হাকিম, আপনাদের হাতেই সব। জুলুমবাজি বন্ধ করার একটা ব্যবস্থা করুন হুজুর।

—জুলুমবাজি ? কিসের জুলুমবাজি ?

—মহাজনের, আড়তদারের।

কথাটা তীরের মতো তীক্ষ্ণ হইয়া মণিমোহনের কানে আসিয়া আঘাত করিল। এই সুরটা ভালো নয়—সাধারণ একজন
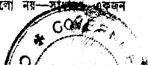
মুসলমান চাষা প্রজার মুখ হইতে কথাগুলি যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি অস্বস্তিকর। জমি লইয়া ঝামেলা নয়, নারীঘটিত ব্যাপারও কিছু নয়, নজরটা সোজা গিয়া পড়িয়াছে মহাজন আর আড়তদারদের উপরে। অবচেতন চিন্তাকে চকিত করিয়া দিয়া মনে হইল, লোকটা যাহা বলিতেছে, এইখানেই তাহার শেষ নয়—ইহার মূল দূরদূরান্তব্যাপী—ইহার জটিল শিকড়ের জাল আরো অনেকখানি গভীরে গিয়াই ঠেকিয়াছে। সহরের পথে ঘাটে বজ্রকণ্ঠে 'স্লোগান' শুনিলে ভয় করে না—পতাকাবাহী জনতার চলন্ত মিছিলটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ভালোই লাগে একরকম। কিন্তু চর ইস্‌মাইলের এই প্রত্যন্তে এমনি একটা সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যেই যেন আসন্ন বৈশাখী ঝড়ের সংকেত লুকাইয়া থাকে।

ঊর্ধ্বচারী দৃষ্টিটা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল—সোজা আসিয়া পড়িল লোকটির মুখের উপরে। যেন তাহার ভিতরের সবটাই মণিমোহন দেখিয়া ফেলিতে চায়। খানিকটা সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশব্দে নদীর হুহু বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে জমির। কলুপাড়ায় আমার বাড়ী—হাটবাজার করতে প্রায়ই এখানে আসতে হয় আমাকে। কাসেম খাঁর ব্যাটা বললেই লোকে চিনবে আমাকে।

—হুঁ। তা আড়তদার মহাজনের ওপরে এত চটেছ কেন?

—তা ছাড়া আর কার ওপরে চটব হুজুর? আপনি তো হাকিম—প্রজার মা বাপ, নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছেন।

যুদ্ধের জন্যে আকাল দেখা দিয়েছে চারদিকে। কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না—আধপেটা খেয়ে কোনোমতে দিন কাটাচ্ছে মানুষ। ওদিকে অসুখ-বিসুখ—সরকারী দাওয়াই-খানাতে এক ফোঁটা ওষুধ নেই যে—

যেমন অস্বস্তি, তেমনি বিরক্তি বোধ করেন মণিমোহন। যেন বক্তৃতায় পাইয়াছে লোকটাকে। কখন যে সংকোচ আর ছায়ার আবরণটা তাহার সরিয়া গেছে—একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা পড়িয়াছে চোখে মুখে—কঠিন হইয়া উঠিয়াছে খাড়া চোয়ালে, হ্রস্ব ভ্রূ রেখাতে। প্রসারিত বুক আর সুগঠিত মাংসপেশীতে যেন শক্তির তরঙ্গ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। চকিতে একটা তীব্র সন্দেহে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। লোকটা পলিটিক্স করিয়া বেড়ায় না তো? গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়িয়া যাহারা—

হাতের সিগারেটটাকে জুতার নীচে মাড়াইয়া সে অসহিষ্ণু-ভাবে বলিল—আমার সময় নেই, সংক্ষেপে বলো।

—আজ্ঞে, সংক্ষেপেই বলব। আপনি হাকিম—কত কাজ, কত ভাবনা আপনার—সে কি আর জানি না। যেন বিনয়ে গলিয়া গেল জমির।

কিন্তু এই বিনয়টাও তেমন প্রীতিকর লাগিল না। ইহার মধ্যে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাস আছে—একটা বিদ্রূপের খোঁচা আছে। হঠাৎ মনে হইল সরকারী বাবু কিংবা হাকিমদের সে সব দিন যেন আর নাই। মাটির তলায় কোথায় বাসুকীর ফণা আর ভার বহিতে পারিতেছে না—বহুদিনের আদায় করিয়া লওয়া

সম্মান আর আভিজাত্যের সিংহাসনটা যেন কিসের স্পর্শে টলমল করিয়া নড়িতেছে।

—বলো, বলো, কী বলছিলে বলো।

—আজ্ঞে চাল তো ক্রমেই আক্রা হয়ে উঠছে। বেশি দর পেয়ে যারা ধান বেচে দিয়েছিল, তাদের ঘরের খোরাক ফুরিয়ে গেছে। আধিয়ার আর জনমজুরদের তো কথাই নেই। চাল কিনতে পারছে না কেউ। সব গিয়ে জমেছে আড়তদার আর মহাজনের গোলায়। ধান কিনতে গেলে পনেরো ষোলো টাকা দর হাঁকে তারা। অথচ হুজুর—বোঝেন তো—

—বুঝি।—মণিমোহনের গলার স্বরে এবারে আর স্বচ্ছন্দ ঔদার্য প্রকাশ পাইল না: তা আমাকে কী করতে হবে?

জমির কিন্তু দমিল না: আপনিই তো সব করবেন হুজুর। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সকলকে চাল ছাড়তে বলে দিন, নইলে মানুষ না খেয়ে মরে যাবে!

লোকটা যেন হুকুম করিতেছে!

চড়া গলায় মণিমোহন বলিল: চাল ছাড়তে বলব? আমার কথা কেন শুনতে যাবে ওরা? মহাজনের ধান—সে যদি বিক্রী করতে না চায়, তা হলে কার কী বলবার আছে?

জমির আবার হাসিল: আপনার কথা শুনবে না? এও কি একটা কথা হল হুজুর? আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনাকে মানবে না—কার ঘাড়ে এমন কটা মাথা গজিয়েছে?

শেষ কথাগুলির মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা আছে তবু মণিমোহন

খুশি হইয়া উঠিতে পারিল না। বলিল, আমি তো বললাম তবু ওরা যদি চাল ছেড়ে না দেয়?

জমিরের চোখ ঝক ঝক করিয়া উঠিল: তা হলে বাকীটা আমাদের ওপরেই ছেড়ে দেবেন। আমরাই দেখব কিছু করতে পারি কি না! বড়লোক হলেই গরীবকে মারবার এক্তিয়ার কারো জন্মায় না হুজুর।

কিন্তু মণিমোহনের প্রসঙ্গটা আর ভালো লাগিতেছে না। প্রসন্ন সকাল—নদীর জলে প্রথম সূর্যের আলো পড়িয়াছে। ভিজা বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে মাটির মিষ্টি গন্ধ। সমস্ত পৃথিবীটার যেন সুর কাটিয়া গেছে—আকাশ বাতাস ঘিরিয়া একটা আসন্ন দুর্যোগের কালো ইঙ্গিত যেন ছায়া ফেলিয়াছে লোকটার সর্বাঙ্গে। অধীরভাবে মণিমোহন বলিল, আচ্ছা, পরে আবার দেখা কোরো। এখন সময় নেই আমার।

—সেলাম হুজুর।

জমির আর দাঁড়াইল না। দুধের ভাঁড়টা মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

মণিমোহন যখন ডাক বাংলোয় ফিরিয়া আসিল—তখন রোদ বেশ চড়িয়াছে। চারিদিকের জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে প্রতিদিনের চিরন্তন কর্মকুশলতা লইয়া। জেলেপাড়ায় কালো প্রকাণ্ড কড়াইগুলিতে গাবের রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে—রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া অতিকায় বেড়াজাল শান্ত রোদে শুকাইতেছে—ফাঁসের এখানে ওখানে রূপোর টুকরার মতো চিক চিক করিতেছে মাছের

বাঁশ। লেংটি পরা এবং উলঙ্গ একপাল ছেলেমেয়ে বিহ্বল ভীত চোখে মণিমোহনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কতকগুলি মাথা ভাঙা সুপারীর গাছ এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া, তিনবছর আগে যে সাইক্লোন বহিয়া গেছে তাহারি চিহ্ন বহন করিতেছে যেন। আদিম বর্বরদের উত্তর পুরুষেরা মাথায় টোকা পরিয়া, হাতে হাঁসুয়া লইয়া এবং কাঁধে লাঙ্গল তুলিয়া নিরীহের মতো কাজ করিতে চলিয়াছে। একজনের হাতে একটা হুঁকা, চলিতে চলিতেই সে তাহাতে গোটাকতক টান মারিল। সব যেন নিজের চক্রপথে ঘুরিতেছে নির্ভুল নিয়মে, এতটুকু ছন্দোপতন হইবার আশংকা বা সম্ভাবনা নাই কোনখানে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ছয় ফুট উঁচু যে সমস্ত মানুষের পায়ের চাপে মাটি টলমল করিত, আজ তাহারা কোথায় গেল?

তাহারা নাই—কিন্তু একেবারেই কি নাই? সময় যখন আসে, তখন তাহারাও কি ধুলা-হইয়া-যাওয়া কবরের তলা হইতে ঠেলিয়া ওঠে না নতুন সাড়া লইয়া, নতুন মত্ততা লইয়া? তাহা হইলে জমিরের চোখে কিসের আগুন দেখিল সে? ওই যে মানুষগুলি অহিংস অনাসক্তভাবে মন্থরগতিতে পথ চলিতেছে— সময় আসিলে ওরা কি অমনি প্রশান্ত স্তিমিত চোখ মেলিয়াই তাকাইয়া থাকিবে? ইহাদের সকলের কাছ হইতেই কি বিন্দু বিন্দু করিয়া আগুন লইয়া জমিরের চোখ অমন দপ দপ করিয়া শিখায়িত হইয়া ওঠে নাই?

ডাক বাংলোর বারান্দায় রাণী বসিয়া আছে। রোগক্লান্ত

মুখশ্রীতে একটা শান্ত কমনীয়তা—একটা অপরূপ মাধুর্য। এই তো বাংলা দেশ—করুণ আর স্নিগ্ধ। বর্ধমানের ধানক্ষেতের পাশ দিয়া দ্রুতগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চলিবার সময় চারিদিকের পৃথিবীকে যেমনটা মনে হয়, ঠিক তেমনই। এখানে ওখানে বিল আর মরা-নদীর জল ঝলমল করিতেছে, তাহার উপরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে খণ্ড চন্দ্রের মধু জ্যোৎস্না। ছোট ছোট গ্রামগুলি আমবাগানের অন্ধকারে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে। কতগুলি লাল নীল আলো হাতছানি দিয়া ডাকিল—কালো কাঁকর ফেলা টিনের শেড্ দেওয়া নগণ্য একটি ষ্টেশনে আসিয়া দম লইল রেল-গাড়ি। সেখান হইতে এক ফালি মেটে পথ দিয়া বাজারটি পার হইলেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারের আশ্রয় মিলিবে। পথের ধারে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইতেছে—সান্ধ্য-শৃঙ্গারকে উপলক্ষ করিয়া বৈরাগীর আখড়া হইতে উঠিতেছে কীর্তনের সুর। বাড়ীর সদর দরজায় একটুখানি ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল দরজাটা। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গলবস্ত্রে একটি মেয়ে প্রণাম করিতেছে—তাহার সীমন্তে এয়োতির চিহ্ন গৃহস্থের মঙ্গলআর কল্যাণের বার্তার মতো জাগিয়া আছে। এই রাণী, আর এই বাংলা দেশ।

সপ্রেমে মণিমোহন রাণীর দিকে তাকাইল: এই সকালে উঠেই বাইরে এসে বসেছ যে? ঠাণ্ডা লাগবে না?

রাণী হাসিল: এত রোদ—সকাল কোথায়? ঠাণ্ডা লাগবে না—ভয় নেই তোমার। কী সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে দেখেছ? ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে?

—জ্বর নেই তো ?

—না।

রাণীর হাতটা টানিয়া লইয়া মণিমোহন নাড়ী পরীক্ষা করিল, হুঁ ছেড়ে গেছে। কবিরাজ চিকিৎসা করে ভালো, পাঁচনের গুণ আছে দেখছি। ঝিণ্টু কোথায় ?

—ওই তো।

একটু দূরেই একটা ঝোপ। নাম-না-জানা একরাশ বেগুনী রঙের ফুলে আকীর্ণ হইয়া আছে। ছোট বড় কতগুলি প্রজাপতি সকলের আলোয় উল্লসিত পাখা কাঁপাইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেই দু একটাকে ধরিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছে ঝিণ্টু।

—প্রজাপতির সন্ধানে আছে বুঝি ? কিন্তু এদিককার ঝোপ জঙ্গল বড় খারাপ, সাপ-খোপ থাকতে পারে। ঝিণ্টু, ঝিণ্টু !

—আসছি বাপী !

—না, এক্ষুনি চলে এসো।

অপ্রসন্ন হইয়া ঝিণ্টু ফিরিয়া আসিল—একেবারে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল বাবার কোলের কাছে। ছোট মাথাটির চুলগুলি আঙুল দিয়া আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল—শিকার মিলল ? ধরতে পারলে প্রজাপতি ?

—না বাপী, ভরী দুষ্টু ওরা। ধরা যায় না।

—ধরতে নেই ওদের। ঝিণ্টুকে দুহাত দিয়া হাঁটুর উপর তুলিয়া আনিয়া মণিমোহন বলিল, আমি তোমাকে খুব মস্ত একটা

ঘোড়া কিনে দেব, আর একটা মোটর। কেমন, তা হলে তো হবে ?

পিয়ারী চা আর টোষ্ট লইয়া দর্শন দিল। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা টোষ্ট অধিকার করিল ঝিণ্টু। রাণী হাসিয়া বলিল, ঝিণ্টু কী বলেছে জানো না বুঝি ? ও আর মোটর কিংবা ঘোড়ায় চড়বে না। একেবারে এরোপ্লেনে উঠে কোথায় যেন যুদ্ধ করতে যাবে।

—সত্যি নাকি ? তা হলে পুরোদস্তুর পাইলট ?

ঝিণ্টুর সমস্ত মনোযোগ হাতের পাঁউরুটির টুকরাতেই সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপে জবাব দিল, হুঁ। রাণী বলিল, বেশ, তাহলে এইকথাই ঠিক রইল। কালই তোমার জন্যে এরোপ্লেন আনা হবে, তাইতে চড়ে তুমি যুদ্ধ করতে যেয়ো। কিন্তু একটা কথা আছে। সেখানে মাও থাকবে না, বাপীও থাকবে না। কার কোলে উঠবে, কার বুকের মধ্যে ঘুমোবে, শুনি ? আর পিয়ারীও যাবে না—আমাদের চা করে দিতে হবে তো। তা হলে যুদ্ধটা কার সঙ্গে হবে ?

ঝিণ্টু বিশ্বাস করিল না, ভয়ও পাইল না। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপরে বলিল, ঈস্ !

রাণী ছেলেকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিল, দুষ্টু !

মণিমোহন সস্নেহে গভীর দৃষ্টিতে ঝিণ্টুর কচি কোমল মুখের দিকে তাকাইল, তাকাইল রাণীর স্নেহ সুকুমার নিবিড় দুইটী কালো চোখের দিকে। তাহার সন্তান, তাহার স্ত্রী, তাহার সংসার। বর্ধমানের পল্লীপ্রান্তে সেই শঙ্খধ্বনিমুখরিত বিরাম মধুর সন্ধ্যাটির

বার্তা যেন ইহারা বহন করিয়া আসিয়াছে। এই চর ইস্‌মাইলে ইহাদের মানায় না—এই খাপছাড়া জগতের বস্তুতার মাঝখানে একান্তভাবেই অনাহূত আগন্তুক।

—আর না রাণী, চলো, এখান থেকে ফিরে যাই।

—কেন, কাজ কি শেষ হয়ে গেছে তোমার?

—কাজ তো শেষ করলেই শেষ হয়ে যায়, আবার বাড়ালেই বাড়ে। আরো পাঁচ সাতদিন থাকতে পারলে অবশ্য ভালো হত, কিন্তু তোমার শরীর টিঁকছে না এখানে। যা হতভাগা দেশ, একটু ওষুধ বিষুধের ব্যবস্থাও তো করা যায় না দরকার হলে। তা ছাড়া আমারও ভালো লাগছে না।

—বেশ তো, তোমার ভালো না লাগে, চলো।

—হুঁ, তাই ভাবছি। দেখি, কাল পরশুর মধ্যেই—

বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাহিরে একটা সাইকেল দ্রুতগতিতে আসিয়া থামিল। নামিল ইউনিফর্ম-পরা একটি মূর্তি—পুলিশের লোক নিঃসন্দেহ। চোখে মুখে তাহার একটা জলন্ত ব্যস্ততা। কিন্তু বাংলোর বারান্দায় রাণীকে দেখিয়াই সে চমকিয়া থামিয়া গেল।

—কে আবার এল এই সময়? একটু বিশ্রাম করতেও এরা দেবে না নাকি? ভেতরে যাও তো রাণী। লোকগুলো জ্বালাতন করে মারলে একেবারে। নাঃ, কালই পালাতে হল এখান থেকে। ঝিণ্টুকে টানিয়া লইয়া রাণী ভিতরে চলিয়া গেল।

—পিয়ারী, ভাখ তো কে এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়।

যিনি আসিলেন, তিনি পুলিশের দারোগা। সন্ত্রস্তভাবে একটা

নমস্কার করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, একটু জরুরি তাগিদেই আপনাকে বিরক্ত করতে হল স্যার, কিছু মনে করবেন না।

পলকের জন্য জমিরের আগ্নেয় দৃষ্টিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। নতুন প্রাণ, নতুন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বলিষ্ঠ বুকের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কোন্ অনাগত কালের সুনিশ্চিত পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে যেন। আর দারোগার মুখে যা প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তা কি রাশীকৃত ক্লান্তি আর অবসাদ? যেন বোঝা টানিতে টানিতে নিজের সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে অনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যাক, পৃথিবী যেমন করিয়া চলিতেছে, তেমনি ভাবেই চলুক। তাহার জীবনটা যেন নিমিত্ত মাত্র—তাহার বেশি এতটুকু কোথাও কিছুই নাই। পুলিশের চাকুরী আর ফকিরিটা তাহার কাছে একই পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রয়োজন হইলেই সব ছাড়িয়া ছুঁড়িয়া কম্বল অবলম্বন করিতে পারে।

মণিমোহন বলিল, বলুন, কী দরকার?

অত্যন্ত সংকোচে দারোগা বসিলেন। ঘর্মাক্ত মলিন টুপিটা রাখিলেন টেবিলের উপরে—শ্রান্তস্বরে বলিলেন, আমি মামুদপুর থানার দারোগা।

—চা খাবেন এক পেয়ালা?

—না, থ্যাঙ্কস স্যার। চা আমি খাই না।

—তা হলে কী বলছিলেন, বলুন।

দারোগা বড় করিয়া একটা নিশ্বাস টানিলেন—যেন বাতাস

হইতে খানিক অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করিয়া লইতে চান। আবার জমিরের ছায়ামূর্তিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। ইহারা দুইজন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমানে সমানেই তো? একজন নতুন জীবনের আলোকে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, আর একজনের সর্বাঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু শ্রান্তির দ্যোতনা। জয় হইবে কার?

দারোগা বলিলেন—আগষ্ট মুভমেণ্টের ব্যাপার আশা করি জানেন স্যার।

—জানব না কেন, ভারতবর্ষের মানুষ তো। কিন্তু কী হয়েছে, এখানে আবার নতুন করে একটা ওইরকম আন্দোলন দেখা দেবে নাকি?

—কী যে বলেন স্যার।—গর্বে গৌরবে দারোগা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের সুর লাগিল: আমার এলাকায় টঁ্যা ফোঁ করতে আমি দেব না, সেদিক দিয়ে শক্ত আছে বনোয়ারী দারোগা।

অকারণেই মণিমোহনের ঠোঁটের আগায় সূক্ষ্ম একটুকরা হাসি খেলিয়া গেল: তা হলে তো আর কথাই নেই; কিন্তু আপনার সমস্যাটা কোথায়?

—তাই বলছিলাম স্যার। আমার এলাকায় না হলেও আমাদের জেলাতে নানা রকম ট্রাবল্‌স হয়ে গেছে, আপনি বোধ হয় সবই জানেন। খবর পেয়েছি, ওখান থেকে জনকয়েক অ্যাব্‌স্কণ্ডার এসে কালুপাড়ায় লুকিয়ে আছে। সদরে খবর

দেওয়ার সময় নেই, তার আগেই হয়তো পালাবে। তাই আপনি একটু হেল্‌প করবেন, মানে নীড্‌ করবেন আমাদের। একজন রেস্‌পন্‌সিব্‌ল অফিসার যখন আছেন—

মণিমোহন অপ্রসন্ন হইয়া গেল। বড় ঝামেলা—অত্যন্ত বিরক্তিকর। তা ছাড়া এ তার কাজও নয়। বলিল, আপনারাই যান না। আমাকে আবার এর ভেতরে কেন?

—বুঝতে পারছেন না স্যার। রিস্কি ব্যাপার তো—হয়তো ফায়ার করতে হবে! আপনি থাকলে আমার দায়িত্বটা কমে, সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়।

—আচ্ছা বেশ যাবো আমি।—মণিমোহনের মুখের উপর দিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল : কখন যেতে চান?

—শুভস্য শীঘ্রম্‌ স্যার—এক সারি দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন দারোগা : একটা পাকা খবরের জন্য অপেক্ষা করে আছি। লোকও পাঠিয়েছি। যদি ডেফিনিট্‌ হতে পারি, তা হলে কাল রাত্রেই রেইড্‌ করব। আজ আমি সদরে একটা টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি—দেখি কী জবাব আসে। ওখান থেকে লোক পাই ভালই, নইলে যা করবার আমাদেরই করতে হবে।

—তা হলে আগেই আমাকে খবর দেবেন।

—দেব স্যার, নিশ্চয় দেব। সে আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আর আপনার কোনো অসুবিধেই হবে না—সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই ঠিক করে রাখব আমরা। আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে থাকবেন,তা হলেই জোর পাবো আমরা—বুঝতেপারছেন না?

—বুঝতে পারছি।—ক্লান্তি-তিক্ত মণিমোহন প্রসঙ্গটা থামাইয়া দিবার জন্যই যেন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, তাই হবে।

দারোগা টুপিটা তুলিয়া লইলেন টেবিলের উপর হইতে। এত উৎসাহ উদ্দীপনা সত্ত্বেও মণিমোহনের মনে হইল দারোগার চোখের কোণায় ক্লান্তির মসীরেখাটা যেন গাঢ়তর হইয়া পড়িতেছে।

—তা হলে আসি স্যার, নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—না, না, মনে করবার কী আছে। এ তো আপনার ডিউটি—আমারও। আচ্ছা, নমস্কার।

প্রত্যুত্তরে দারোগা আবার খানিকটা বিগলিত হাসি হাসিলেন, তারপরে সাইকেলে উঠিয়া বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার অনেক কাজ—এতটুকু সময় নাই।

রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া শূন্য চোখে নদী আর দিগন্তের দিকে তাকাইল মণিমোহন। আবার এক নতুন বিড়ম্বনা দেখা দিল—ফেরারী ধরিয়া বেড়াইতে হইবে তাহাকে। যাহারা দেশে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, যুদ্ধকালীন নিরাপত্তায় বিঘ্ন সঞ্চার করিয়াছে—অপরাধী তাহারা নিশ্চয়ই—শাস্তি তাহাদের পাইতেই হইবে?

কিন্তু ইহারা কাহারা? পলকের জন্য তাহার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল: কী ধাতু দিয়া এই ছেলেগুলি তৈরী হইয়াছে? ঘর থাকিতেও ঘর ভাঙিয়া মৃত্যু এবং রাজরোষের অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল কী কারণে এবং এই সর্বনাশা প্রেরণাই বা পাইল কোথা হইতে?

উপনিবেশ

মানস-দৃষ্টির সামনে ভাসিয়া গেল আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দী শিবির। কর্মী পত্নীর মৃত্যু-শয্যার পাশে ধ্যান-স্তিমিত নেত্র মেলিয়া বসিয়া আছে Naked Fakir of India—তাহার মুখের উপরে প্রসন্ন সূর্যালোক স্বর্গ কিরণের মতো বিচ্ছুরিত হইতেছে।

## ছয়

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলরাম ঘরে ফিরিলেন। কিছুই বোঝা যাইতেছে না—কেমন একটা অনিশ্চয়তায় ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে মন। কেন এই যুদ্ধ? মানুষ এমনভাবে কিসের জন্য লড়াই করিয়া মরে? বোমা আর কামানের মুখে ঘর বাড়ি উড়াইয়া দেয়, রক্তে ভাসাইয়া দেয় মাটি? দেশ আর গ্রাম শ্মশান হইয়া যায়। কীই বা হয় যুদ্ধে একটা বিরাট জয়লাভ করিয়া? যে জিতিল, মড়ার হাড়ের উপরে সিংহাসন বসাইয়া এমন কোন্ অপূর্ব স্বর্গসুখটা সে ভোগ করে।

কে যুদ্ধ চায়? বলরাম চান না—মণিমোহন চায় না, চর ইস্মাইলের কেউ চায় না, এমন কি নির্বোধ রাধানাথ পর্যন্ত চায় না। তবু কেন এই যুদ্ধ?

সমস্ত ব্যাপারটাকে সমাধানহীন একটা বিরাট গোলকধাঁধার মতো মনে হয় তাঁহার! কিছুদিন আগে এই প্রশ্নটাই তিনি করিয়াছিলেন মণিমোহনকে।

অত্যন্ত করুণাভরে মণিমোহন হাসিয়াছিল। অনেকগুলি

কথাই সে বলিয়াছিল—উপনিবেশ, বাণিজ্য-বিস্তার, আর্থিক একচেটিয়া সুবিধা—বলশেভিক বিনাশ, গণতন্ত্রের প্রসার ও রক্ষা এবং আরো অনেক কঠিন কঠিন ব্যাপার!

বলা বাহুল্য, বলরাম কিছু বুঝিতে পারেন নাই। চরক সংহিতা, ভেষজ্য-বিজ্ঞান, নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা অথবা নিদান-তত্ত্বে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ছাগলাদ্য-ঘৃত তিনি নির্ভুল-ভাবে তৈরী করিতে পারেন, সহস্রবার পারদকে জারিত করিয়া লইবার প্রক্রিয়া তাঁহার জানা আছে, রস-সিন্দুর আর মকরধ্বজের তফাৎটা বলিয়া দিতে পারেন একবার চোখ দিয়া দেখা মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ-বিজ্ঞান নিদান তত্ত্বের চাইতেও কঠিন বলিয়া তাঁহার মনে হইল।—তা ছাড়া মণিমোহন হাসিয়া শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিল, যুদ্ধটা হচ্ছে একটা জৈবিক প্রয়োজন—দার্শনিকদের এই মত।

বলরাম হাঁ করিয়াই ছিলেন। বলিলেন, তাই নাকি? তা বেশ। কিন্তু যারা যুদ্ধ করছে না তাদের এত কষ্ট দেওয়া কেন? ভাত নেই, কাপড় নেই—

—তারও দরকার আছে। একজন ডাচ্ দার্শনিক—ডাচ্ বোঝেন, ওলন্দাজ?

বলরাম বোঝেন না। তবু মাথা নাড়িতে হইল।

—ষ্টিন্‌মেৎস্ তাঁর নাম। তাঁর বই আছে একটা—ফিলসফি অব্ ওয়ার। তাতে তিনি বলেছেন যুদ্ধের সময় অসামরিকদের খুব বেশি করে কষ্ট দাও, খেতে দিও না—শুধু চোখ দুটো রেখে দাও জল ফেলবার জন্যে। কেন, জানেন?

—কেন ?

—যাতে তারা মনে করতে পারে যে তাদের এই দুর্গতির জন্মে শত্রুরাই দায়ী। ফলে শত্রুপক্ষের প্রতি তাদের মন বিদ্বেষ ও হিংসায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আর তা হলেই যুদ্ধ জয় অনিবার্য। মুসোলিনীও এই কথাই বলেছেন। বুঝলেন তো ?

বলরাম বুঝিলেন না। বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও লাভ নাই। যাহারা পণ্ডিত, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব অনুকূল নয়। কোনো একটা জিনিষকে তাহারা সহজ করিয়া বুঝাইতে পারে না। কোথা হইতে শক্ত শক্ত ব্যাপার আমদানী করিয়া আগাগোড়া সব কিছুকে দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য করিয়া তোলে। যুদ্ধ কেন হয়, তাহার পিছনে এই যে বিরাট তত্ত্ব আর তথ্যের অরণ্য লুকাইয়া আছে একথা কোনদিন বলরামের কল্পনাতেই আসিয়াছিল নাকি!

কিন্তু সেই হইতে মণিমোহনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা তিনি ছাড়িয়াই দিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যে কাগজটা তিনি পড়েন, তাহার পাতায় পাতায় প্রতিদিন দেখা দেয় অস্পষ্ট আর রহস্যময় রাশীকৃত খবর। পৃথিবীতে এত জায়গা, এত বিচিত্ররকমের নাম আছে, এও কি কোনদিন কল্পনায় আসিয়াছিল। কোন কোন নাম এমন উৎকট যে উচ্চারণ করিতে গেলে মানুষের আক্কেল দাঁত অবধি খট খট শব্দে নড়িয়া ওঠে। অথচ এই দুইটা বছরের বিরাট দুনিয়ার ভূগোলটা বলরামের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। জ্ঞানের

প্রতি বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান ভাণ্ডার যে পুরাদস্তুরই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবে কে ?

কিন্তু কী যে হইবে! জ্ঞান বাড়িতেছে বাড়ুক, দৈনন্দিন সমস্যার কোনো সমাধানই তো চোখে পড়িতেছে না। যুদ্ধটা যেন বাধিয়াছে প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিসপত্রের সঙ্গে। কামানে বন্দুকে মানুষ মরিতেছে, মরিতেছে চাল, ডাল, নুন, আটা, তেল, কয়লা আর কুইনিন।

ভাবিয়া বলরাম আর থই পান না। চুলকাইতে চুলকাইতে টাকের উপরে খানিকটা রক্তপাতই করিয়া ফেলিলেন তিনি। অত্যন্ত বিব্রত আর বিপন্ন মুখে তাকিয়াটায় তিনি ঠেসান দিয়া বসিলেন। দেওয়ালের গায়ে কাঁচ ভাঙা ঘড়িটা স্তব্ধ হইয়া আছে—একটা বড়সড়ো টিকটিকি পোকার সন্ধানে পেণ্ডুলামটার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই সেটা যেন কুম্ভকর্ণের মতো অকস্মাৎ যুগনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। অত্যন্ত বিরক্তভাবে মিনিট খানেক কটাকট্ শব্দ করিয়া এলোমেলো খানিকটা সময় জানাইয়া দিয়া আবার অনন্ত নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল ঘড়িটা।

অন্যমনস্কভাবে সেদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন বলরাম। বড় একটা হাই তুলিয়া তাকিয়া হইতে পিঠ খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিলেন। যেন কী একটা ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া হাঁক দিলেন, রাধানাথ ?

—যাই বাবু—বাহির হইতে সাড়া দিয়া রাধানাথ প্রবেশ করিল। বৃহদাকার একটা কাদামাখা মাগুর মাছ তাহার

হাতের মধ্যে ছটফট্ করিতেছে। মুখটা বিকৃত করিয়া কহিল, উঃ, কাঁটা দিয়েছে শালার মাছ।

—মাছ ধরছিলি বুঝি? বাঃ বেশ, বেশ।—বলরাম খুসি হইয়া উঠিলেন: খুব বড় মাগুর মাছ তো। পেলি কোথায় রে?

রাধানাথ বলিল, কাঁঠাল গাছে।

—কাঁঠাল গাছে।

—তা ছাড়া আবার কি? শালারা কি এমন জাত যে ধরা দেবার জন্তে হাঁ করে বসে আছে? এ ঘরের মাছ।

দপ করিয়া বলরামের উৎসাহটা নিবিয়া গেল।

—ঘরের মাছ? তা হলে বাইরে গেল কেমন করে?

—তা আমি কি করব বাবু? রাধানাথ নিজেকে সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইল একটা: আমার কী দোষ? পরশু দিন এককুড়ি কিনে হাঁড়িতে জীইয়ে রেখেছিলাম, আজ সকালে উঠে দেখি দুটো না তিনটে রয়েছে। হাঁড়ীর ঢাকা উল্টে ফেলে রাতারাতি চম্পট দিয়েছে সব। তারই একটাকে অনেক খুঁজে-পেতে ধরে আনলাম।

—বটে, বটে! রোষে বলরাম বিকচ্ছ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন: মাছগুলো আকাশ থেকে পড়ে, তাই না? পয়সা দিয়েই ওগুলোকে কিনতে হয় না, না? দেখছি তুই ব্যাটাই আমাকে ফতুর করবি।

—তা কি হবে! বক বক করলে তো মাছ আসবে না। নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে প্রস্থানের উপক্রম করিল রাধানাথ।

—যাচ্ছিস্ কোথায় ? সর্বনাশ যা করবার তা তো করেছিস, এখন এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা হতভাগা।

—গালমন্দ করবেন না, সেজে এনে দিচ্ছি—গজেন্দ্র গমনে রাধানাথ বাহির হইয়া গেল। পাজী, বদমাস। নিজের মনে গালিবর্ষণ করিয়া বলরাম ক্রোধটাকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনো লাভ নাই ওকে গালিমন্দ করিয়া। চাকর বাকর লইয়া ঘর সংসার করিতে গেলে এ সমস্ত ক্ষতি অপরিহার্য। কোনো জিনিষের জন্ত দরদ নাই, গৃহস্থের জন্ত মায়া নাই এতটুকুও। প্রাণ ভরিয়া চুরি চামারি করিতেছে নিশ্চয়।

তবু রাধানাথ না থাকার অবস্থাটাও কল্পনা করা চলে না। বিশ বছর ধরিয়া ওরই সঙ্গে সংসার করিয়া আসিতেছেন, মানাইয়াও লইয়াছেন একরকম। মুখে মুখে উত্তর করে—ওই ওর দোষ; তবু বলরামের ধাতটা একরকম চিনিয়াছে, যেমন করিয়া হোক চালাইয়া লয়। মাঝখানে শুধু ছেদ পড়িয়াছিল দিন কয়েক, শুধু কয়েকটা মাস পারিবারিক জীবনের একটা স্নেহ-মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন তিনি। তার পরেই—

বুকের মধ্যে একটা ব্যথার চমক টনটন করিয়া উঠিল। শুধু মানসিক নয়—শারীরিকভাবেও কয়েক বছর ধরিয়া এই একটা নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। এ কি আসন্ন মৃত্যুর সংকেত ? বয়স বাড়িয়াছে, তাই কি অন্তিমের আহ্বান আসিয়া বুকের মধ্যে তাহার দাবীটাকে জানাইয়া দিয়া যায় ?

—বাবু তামাক।

—রেখে যা।

ফরসীতে তামাক পুড়িতেছে। নলটা মুখে করিয়া বলরাম ভাবিতে লাগিলেন একটা কথা। এতদিন ভাবিয়াও সে কথার কোনো উত্তর মেলে নাই তাঁহার কাছে। কেন চলিয়া গেল মুক্তো? সজ্ঞানে কি অপরাধ তিনি করিয়াছিলেন যাহার জন্য সমাজ ধর্ম সব ছাড়িয়া মুক্তো এমন একটা অস্বাভাবিক জীবনকে বাছিয়া লইল? জাতি ছাড়িল, সমাজ ছাড়িল, বিগত-যৌবন মুরুলগাজীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল? অপরাধ তিনি হয়তো করিয়াছিলেন, কিন্তু সেজন্য কোনো দায়িত্বই কি মুক্তোর ছিল না? তা ছাড়া সে অপরাধের এমনি করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত হইল? মুক্তোই কি সুখী হইতে পারিয়াছে?

ডি সিল্‌ভার ছেলে ডি ক্রুজা সংকুচিত হইয়া ঘরে ঢুকিল। ভাবনার জালটা ছিঁড়িয়া বলরাম তাহার দিকে তাকাইলেন।

—কি রে, কী খবর?

—আজ বাবাকে দেখতে যাবেন না একবার?

—কেন, কী হয়েছে আবার! জ্বর ছাড়ে নি?

ম্লানমুখে মাথা নাড়িয়া ক্রুজা বলিল, না।

ফরশীর নল দিয়া পেশাদারী ভঙ্গিতে খানিকটা ধূমোদ্গীরণ করিলেন বলরাম: জ্বর ছাড়ল না, তাই তো। তা পাঁচনটা খাইয়েছিলি ঠিক মতো?

—হুঁ।

—আর পথ্য? সাবু?

—না, সাবু পাইনি।

—তা তো পাবিই না—নিরীহ ডি ক্রুজার উপরে বলরাম সমস্ত ক্রোধ এবং বিরক্তি একবারে বর্ষণ করিয়া দিলেন : বাপের জন্ত এতটুকু দরদ বা মায়া আছে তোর! মরে যাবে নাকি লোকটা?

—কী করব, কোথাও তো পাচ্ছি না?

—যা, আবার খোঁজ গিয়ে। পথ্য নেই, কিছু নেই, খালি খালি ওষুধেই কারো জ্বর সারে নাকি কখনো? যা, আমি যাবো বিকেল বেলায়। আর সাবধান, মুরগীর ঝোলটোল খাওয়াসনি, তা হলে বাপ কিন্তু সোজা মেরীর পাদপদ্মে গিয়ে পৌছুবে, এই বলে রাখলাম।

* * * *

নৌকাটা থামিতেই গঞ্জালেস্ তীরে নামিয়া পড়িল। তারপর গ্রামের দিকে আগাইতে গিয়াই সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

এই তো চর ইস্‌মাইল। দশ বছর আগে সে যাহাকে পেছনে ফেলিয়া গিয়াছিল—একটা তীব্র অপমান বোধ এবং প্রতিশোধের কঠিন সংকল্প লইয়া। মরা রক্তে সেদিন বিদ্রোহী প্রাণের বান ডাকিয়া গিয়াছিল। পর্তুগীজদের মেয়েকে, তাহার ভাবী স্ত্রীকে কতগুলা বর্মী আসিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল! কিছু করিতে পারে নাই গঞ্জালেস্, শুধু পাথরের মূর্তির মতো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আর চিত্র করা পুতুলের মতো দুইটা বিস্ময় বিহ্বল চোখ মেলিয়া শুনিয়াছিল সেই অসহ্য লজ্জা আর অপমান মেশানো পরাজয়ের কাহিনী।

ডি সুজা পাগল হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঘোলা চোখ যেন রক্ত দিয়া মাখানো, বন্য জন্তুর মতো দুর্গন্ধ নিশ্বাস ফেলিতেছে। অকারণে হা হা করিয়া উঠিয়াছিল খানিকটা। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এর শোধ নিতে পারবে, লিসিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে তুমি ?

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া শরীরের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুতের তীব্র চমক খেলা করিয়া গিয়াছিল গঞ্জালেসের। এক চুমুক বিষাক্ত হুইস্কি পান করিলে যেমনটা হয় ঠিক তেমনই। মনে পড়িয়া গিয়াছিল দিগ্বিজয়ী পূর্ব পুরুষদের। যাহাদের পায়ের নীচে হাজার হাজার বুনো ঘোড়ার মতো সমুদ্র গর্জাইয়া উঠিতেছে —নোনা ফেনার রাশি গড়াইতেছে তাহাদের মুখ হইতে ; আর সেই ঘোড়ার যাহারা আসোয়ার, তাহাদের মাথায় কালো চামড়ার টুপি, তাহাদের চোখের দৃষ্টি শকুনের চাইতেও তীক্ষ্ণ এবং দূরগামী। বজ্র কঠিন হাতের মধ্যে ক্ষুধার্ত বন্দুক শিকারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কবে দূর সীমান্তরেখায় বকের মতো পালের সারি উড়াইয়া বাণিজ্য বহর দেখা দিবে। তাহাদের জাহাজের ডেকের উপরে লোহার কামান গলা বাড়াইয়া আছে—বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল তাহাদের পালে ড্রাগনের বিকট মুখাকৃতি।

ঠিক তাহাদের মতোই সংকল্প লইয়া, মনের মধ্যে তাহাদের মতোই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া গঞ্জালেস্ ভাসিয়া পড়িল লিসির সন্ধানে। চট্টগ্রাম, আরাকান, বর্মা। কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায়

নাই। পৃথিবীতে এত অসংখ্য মানুষ, এত অসম্ভব কোলাহল আর কলরব; যে একবার হারাইয়া যায় ডাকিলে সে আর শুনিতে পায় না—কলরব-মুখর জনতায় লিসিও হারাইয়া গিয়াছে।

চেষ্টা সার্থক হয় নাই। আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছিল ডি-সুজা। কিন্তু গঞ্জালেসের মনের মধ্যে যে আঘাত বাজিয়াছিল সেটাকে তো সে ভুলিতে পারিল না। জীবন যে পথে চলিতেছিল, তাহাতে সুর কাটিয়া গেছে। কী যেন নাই, কিসের অভাবে নিজেকে একান্তভাবে ব্যর্থ আর অভিশপ্ত বলিয়া মনে হয়। সেই মানসিক অস্বস্তিটার হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্যই যেন গঞ্জালেস্ প্রাণপণে মদ ধরিল—একান্তভাবে তলাইয়া গেল উদ্দাম একটা মত্ততার মধ্যে। তার পরের দিনগুলি সব অস্পষ্ট—কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না—যেন এক সারি ছায়ামূর্তির মিছিল চলিয়াছে। যুদ্ধ আসিল, বোমা পড়িল, গঞ্জালেস্ চোখের সামনেই দেখিল রক্ত আগুনের বীভৎস লীলা। তারপরে হঠাৎ কী যে হইয়া গেল, কথা নাই, বার্তা নাই, হঠাৎ একদিন নৌকা ভাসাইয়া গঞ্জালেস্ আসিয়া দর্শন দিল চর ইস্‌মাইলে।

কিন্তু চর ইস্‌মাইলে কেন আসিল সে? দশ বছর পরে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ নদীর পঙ্কস্তরের উপর দাঁড়াইয়া গঞ্জালেস্ এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল: কোন্ খেয়ালে সে দূর সমুদ্রের মোহানার মুখে এই অখ্যাত-অজ্ঞাত দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল? অথচ যদি সে কলিকাতায় যাইত, তাহা হইলে একটা আশা ভরসা ছিল। এখানে আশ্রয় পাইবে কোথায়, চলিবেই বা কেমন করিয়া? আর

সব চাইতে দরকারী কথা এই : হুইস্কির সদাব্রত এখানে মিলিবে কোথা হইতে ?"

এখানে আসিবার কী দরকার ছিল তাহার ? লিসির স্মৃতি ? সে স্মৃতি কী এতই মনোরম—যে জন্তে এখানে না আসিলে রাত্রে তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছিল ? আসল কথা—সেই রাত্রের বিভীষিকা আর নেশার মাদকতা একটা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহার স্নায়ুতে, তাই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই সে সোজা চর ইস্মাইলের উদ্দেশ্যেই নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এখন কোথায় যাইবে সে, কী করিবে ?

গঞ্জালেস্ নিজের মনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিস্ দিতে লাগিল। এমন সময় তাহার দেখা হইল ডি-ক্রুজার সঙ্গে।

চোখের দৃষ্টি সংকুচিত করিয়া গঞ্জালেস্ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিল ডি-ক্রুজাকে। তারপর ডাকিল, এই ছোকরা, শুনে যা, আয় ইদিকে।

বিচিত্র সম্ভাষণে ক্রুজা চমকিয়া দাঁড়াইল। মুখের উপরে বিদ্রোহ ঘনাইয়া তুলিয়া বলিল, আমাকে ডাকছ ?

—তা ছাড়া কাকে ডাকব ? ওই সুপুরী গাছটাকে নাকি ?

—কেন, কী দরকার ?

—তোদের বাড়ি কোথায় ?

—জানি না—উদ্ধতভাবে ক্রুজা ফিরিবার উপক্রম করিল।

—এই, দাঁড়া—খপ করিয়া একটা থাবা মারিয়া তাহার কাঁধটা চাপিয়া ধরিল গঞ্জালেস্ : বেশি বথামি করিস্ তো এক চাঁটিতে চোয়াল উড়িয়ে দেব। চিনিস আমাকে ?

ডি-ক্রুজা চেনে না। কিন্তু গঞ্জালেসের আরক্ত চোখ এবং প্রকাণ্ড একখানা হাতের স্পর্শে চিনিতে তাহার বৈশিক্ষণ সময় লাগিল না। ক্ষীণস্বরে বলিল, কী করতে হবে?

—আমি তোর মামা বুঝলি? তোদের বাড়িতে বেড়াতে এলাম।

ক্রুজা হাঁ করিয়া রহিল।

—অমন করে তাকিয়ে আছিস কি? নে, নৌকা থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে ফেল সব, তারপর নিয়ে চল তোদের বাড়ীতে। ভয় নেই, তুইও বাদ পড়বি না।

পকেট হইতে একটা চকচকে নতুন টাকা বাহির করিল গঞ্জালেস্। আঙুলের উপর সেটাকে বার কয়েক নাচাইয়া টং টং করিয়া বাজাইল। বলিল, দেখছিস?

ক্রুজা কী ভাবিল কে জানে তারপর নিঃশব্দে নৌকার দিকে অগ্রসর হইল।

দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে নদীর বিশাল জলরাশি তখন জ্বলিতেছে।

## সাত

দুপুরবেলা আকাশ কালো করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল।

নদীর জলে মেদুর ছায়া বিকীর্ণ করিয়া, তাল নারিকেলের বীথিকে ধারা-বর্ষণে স্নিগ্ধ করিয়া এবং তেঁতুলিয়ার কলতরঙ্গে উদ্দাম উল্লাস জাগাইয়া ঘণ্টা দু-তিন বেশ এক পসলা ঝরিয়া গেল। কিন্তু আকাশের কান্না থামিল না—থাকিয়া থাকিয়া এক একটা দমকা বহিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে ঝরিতে লাগিল ঝির-ঝির-ঝির—

সন্ধ্যা ঘনাইতেছে অসময়ে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া বিভ্রান্ত বিহ্বল একদল কাক নারিকেল পুঞ্জের ওপর তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে গোল হইয়া উড়িতেছে—বাতাসের ঝাপ্‌টায় ওদের কারো বাচ্চা নীচে পড়িয়া গেছে বোধ হয়। তাণ্ডব-তালে ব্যাঙের কনসার্ট বাজিতেছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত কলরব কোলাহলকে যেমন করিয়া হোক ছাপাইয়া উঠিবার সংকল্প করিয়াছে ওরা।

কর্মহীন অলস দিন। মাসটা যদিও আষাঢ় নয়—তবু এই আশ্চর্য জগৎ, সীমানাহীন অন্ধ আকাশ, বিশৃঙ্খল একটা বিরাট নদী, সব মিলাইয়া নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ আর নির্বাসিত মনে হয়। কবিরা কল্পনা করিতে পারে শাশ্বত বিরহের স্মৃতি-মধুর একটা মীড় মূর্ছনা যেন। রাণী তো কাছেই, তবু ভাবিতে ভালো লাগে : চঞ্চল ভ্রমরের মতো ছুটি চোখের উৎসুক দৃষ্টি দিগন্তে মেলিয়া দিয়া কে

দেখিতেছে নবঘন শ্যামশোভাকে—কোন রত্নপুরীতে কে যেন 'মন্দোত্রাঙ্কং বিরচিত পদং গেয়মুদ্গাতু কামা—'কিন্তু 'তন্ত্রীমার্দ্রা নয়ন সলিলৈঃ—'। কালিদাস কথনো চর ইস্মাইলে আসিবার সুযোগ পান নাই, যদি আসিতেন তাহা হইলে রামগিরির চাইতে এটাকে ঢের বেশি অনুকূল পরিবেশ বলিয়াই তাঁহার মনে হইত। কুর্চিফুল নাই-ই থাকিল, কিন্তু নাম না-জানা যে মিষ্টি একটা বুনো ফুলের গন্ধ বাতাসে আসিতেছে—

কোথায় রামগিরি—কোথায় কুর্চি—কোথায় বা 'প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক বনিতা!' তৈলাক্ত হ্যাট, বিবর্ণ ওয়াটারপ্রুফ্ এবং জুতার ওপরে একরাশ কাদা লইয়া মামুদপুর থানার দারোগার ঘটনাস্থলে প্রবেশ। অলকা হইতে যক্ষ নয়, পাতাল হইতে রক্ষ আসিয়া দর্শন দান করিল।

মণিমোহন বলিল, বসুন।

—না স্যার, বসব না। অনেক কাজ, বসবার সময় হবে না। শুধু আপনাকে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতে এলাম।

—কোন্ কথাটা?

—সেই রেইডের ব্যাপারটা।

—ওঃ—মণিমোহনের মনটা চমকাইয়া উঠিল। আর কি দিন ছিল না। আকাশ বাতাস ঘিরিয়া এখন স্বপ্ন ঘনাইতেছিল, এখন সমস্ত শিরা গ্রন্থিকে শিথিল করিয়া দিয়া আশ্চর্য একটা অনুভূতির মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে তলাইয়া যাইতে ভালো লাগিতেছিল—বাতাসে নাম না-জানা ফুলের মৃদু মধুর অলস সুরভির মতো মনে পড়িতেছিল

কাকে? এমুনি একটা সন্ধ্যায় দুটি বাহুর নির্মম পেষণে কোমল বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল কে, কার সুগন্ধি নিশ্বাস মুখের ওপরে ছড়াইয়া পড়িয়া নেশায় যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল?

দারোগা বলিলেন, জল বৃষ্টি, আপনার একটু কষ্টই হবে স্যার। কিন্তু কী করা যায়—এর চাইতে ভালো দিন আর হবে না।

—হুঁ।

—অ্যাবস্‌কণ্ডার, ঠিক তো নেই, যখন কোন দিকে রাতারাতি সটকে পড়ে। আমরা অবশ্যি কড়া নজর রাখছি, কিন্তু যা দেশ—বোঝেনই তো সব। কোনো নদী নালা দিয়ে একবার ছটকে বেরুতে পারলেই গেল। তারপর সমুদ্রের মোহানায় কে কাকে খুঁজে বেড়াবেন বলুন। এ তো আর ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের রাস্তা নয় কিংবা ই বি আরের রেলগাড়ি নয় যে চারদিকে নজর দিলেই—

—বুঝেছি। কথাটাকে মাঝখানেই মণিমোহন থামাইয়া দিল। হঠাৎ আশ্চর্যভাবে মনে পড়িল ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতার উক্তি: আমার দেশ শুধু শহর নয়, আমার দেশ শুধু নাগরিক-সমষ্টিও নয়; ভারতবর্ষের প্রাণ ছড়াইয়া আছে অজ্ঞাত অখ্যাত অগণ্য পল্লী জনপদের প্রান্তে প্রান্তে, সেখান হইতে একদিন বৃহত্তর মহাজীবনের উদ্বেল তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া দিবে এই—

চকিতে মণিমোহন অনুভব করিল একটা জিনিস—যা এতদিন সে ভাবিতেও পারে নাই। চর ইস্‌মাইল শুধুই কি একটা পাণ্ডব-বর্জিত দেশ—ভদ্রলোকের কল্পনার বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার ন্যায় একটা আশ্চর্য রহস্যপুরী? অথবা বিরাট এই

## উপনিবেশ

বাংলা দেশের একটা অলক্ষ্য প্রাণকেন্দ্র—যেখান হইতে একদিন উজান স্রোত বহিয়া জীবনে এবং চিন্তায়, রাষ্ট্রে এবং সভ্যতায় নতুন প্লাবন বহাইয়া দিবে? এতদিন তো শহরই দু হাতে দান করিয়া আসিতেছে, এবার কি পল্লীর সেই ঋণ পরিশোধের পালা দেখা দিল?

নিঃশব্দে একটা সিগারেট বাহির করিয়া মণিমোহন ধরাইল, ধোঁয়ার জাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া চলিল মেঘম্লান আকাশের দিকে।

—তা হলে আজকেই ঠিক?

—আজকেই।

—শহরের কোনো খবর পেলেন?

—এখনো পাই নি। টেলিগ্রাম আফিস সেই ওপারে—মানে একবেলার পথ। তা ছাড়া যুদ্ধের চাপে লাইন এমন এন্‌গেজড্‌ যে, কখন গিয়ে তার পৌঁছুবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। অথচ আর দেরি করাও ঠিক নয়—কখন যে ফসকে হাত থেকে পিছলে যাবে বলা যায় না। তাই বলছিলাম আর দেরী না করে যা পারি আমরাই করে ফেলি।

পিয়ারী আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল। বর্ষার দিনে রাণী নিশ্চয় খিঁচুড়ির বন্দোবস্ত করিয়াছে—পেঁয়াজ আর আধসেদ্ধ মুগের ডালের একটা রোমাঞ্চকর গন্ধ আসিতেছে। আর টেবিলের ওপরে রাখা দারোগার তৈল-মলিন টুপিটা হইতে ভাসিতেছে ঘামের দুর্গন্ধ। লণ্ঠনের আলোয় দারোগার চোখের নীচে অত্যন্ত গাঢ়

একটা কালিমার রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—ক্লান্ত অবসাদ, জোয়াল টানিয়া চলা নির্বোধ পশু বিশেষের অবসন্ন প্রতিচ্ছবি।

মণিমোহন কহিল, ধরতে পারলে আপনার নিশ্চয় কিছু আশা আছে।

—তা তো আছেই।—অত্যন্ত খুশি হইবার চেষ্টা করিয়া দারোগা হাসিলেন: ইন্‌পেক্টরী তা হলে এবার হয়ে যেতে পারে স্যার। আর সাত আট বছরের মধ্যেই তো রিটায়ার করতে হবে, এখনো যদি চান্স না পাই তা হলে আর—

—অনেক দিন সার্ভিস তো হয়ে গেল আপনার, এত দিন চান্স্ পেলেন না কেন?

—কপাল স্যার, কপাল। দারোগা ললাটে করাঘাত করিলেন: কত জুনিয়ার চোখের সামনে দিয়ে টপাটপ্ টপকে গেল, আমি বসে বসে দেখলাম। কবার তো নমিনেশনও গেল কিন্তু ধোপে টিঁকল না। আসল ব্যাপার কী, জানেন? হিন্দুর আজকাল আর কোনো আশা ভরসা নেই—পীরের দরগায় জাত জন্ম জবাই দিতে না পারলে সরকারী চাকরীতে সুবিধে হবে না। পাকিস্তান পাকিস্তান কী ওরা বলছে স্যার, পাকিস্তান তো হয়েই আছে অনেককাল আগে।

মণিমোহন হাসিল: দেখুন, এই ফাঁকে যদি কিছু করে নিতে পারেন।

—সেইজন্তেই তো এমন করে লেগে পড়েছি স্যার। ঠেলে দিলে ক্রিমিন্তাল এলাকায়, ভাবলাম প্রচুর স্কোপ্ পাব—গ্যাংকে

গ্যাং ধরে দিয়ে একটা পাকাপোক্ত রেকর্ড করে রাখব। কিন্তু এসে যা নমুনা দেখলাম তাতে গ্যাং তো দূরের কথা, এখন পৈতৃক প্রাণটা টি'কিয়ে রাখতে পারলে হয়। এগুলো তো মানুষ নয়, জানোয়ার।

সত্যিই ইহারা মানুষ নয়। মণিমোহনের মনে হইল: মানুষ নয় বলিয়াই এখনো বাঁচিয়া আছে। পঞ্চাশ ইঞ্চি ধুতির কোঁচা পায়ে জড়াইয়া, ট্রামে বাসে মারামারি করিয়া এবং ডায়বেটিজ ও ডিস্‌পেপসিয়ার নাগপাশে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়া যাহারা অতি-মানুষ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের চাইতে ইহারা একটু আলাদা বই কি। হিংস্র উন্মত্ত যে পশুশক্তি নিজের প্রচণ্ড বলশালিতায় সমস্ত পৃথিবীর উপর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারে—ইহারা তাহাদেরই দলে। ধুতি চাদরে বিড়ম্বিত মানুষ যেখানে হিসাব নিকাশ চুকাইয়া দিয়া তুলসীর মালা হাতে করিয়া পারত্রিক নিষ্কৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—তখন দেহে মনে অমিত পাশব-শক্তি সঞ্চয় করিয়া ইহারা জীবন অভিযানের স্বপ্ন দেখিতেছে। জমিরের চোখের আগুনের সেই দীপ্তিটা মণিমোহন কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

দারোগা কহিলেন, যাক—ও নিয়ে আর দুঃখ করে কী হবে। আমিও বামুন স্যার, শাস্ত্র বলে পাতা চাপা কপাল। পাতা উড়েই যাবে একদিন—কে জানে এবারেই সে সুযোগটা পেয়ে গেলাম কিনা।

—পাবেন বলেই তো মনে হচ্ছে।

পুলকিত হইয়া ব্রাহ্মণ দারোগা দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন : আপনাদের আশীর্বাদ। কিন্তু আজকে রাত্রেই স্যার। আন্দাজ নটা সাড়ে নটা আপনাদের নেবার জন্যে নৌকো পাঠিয়ে দেব। ভালো পান্‌সী নৌকো—আরাম করে যেতে পারবেন, পুরু গদীও দিয়ে দেব।

—তাই দেবেন।

দারোগা উঠিয়া পড়িলেন : নমস্কার স্যার। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—

—সে তো দিলেনই, সেজন্যে আর বিনয় করে কী করবেন। আচ্ছা, আসুন আপনি তা হলে—

থতমত খাইয়া জুতার তলায় কাদার ছপাছপ্ শব্দ তুলিয়া দারোগা বাহির হইয়া গেলেন।

বাহিরে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি ঝরিয়া চলিয়াছে ; ভিজা মাটির গন্ধ বহিয়া 'বায়ু বহত পূরবৈয়া।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িতেছে কাজরী গানের একটা পংক্তি : "আয়ি রে গগন মে কারী বদরিয়া—"

কিন্তু কোথায় বা কাজরী গান, কোথায় নীপ-শাখায় দোলনা দুলিতেছে—কদমের রেণু উড়িয়া পড়িতেছে। দুলিতে দুলিতে অধরে অধর মিশিতেছে—মৃদঙ্গ আর খঞ্জনীতে বাজিতেছে মল্লারের সুর। স্বপ্ন নয়—স্বপ্নের চাইতেও দূরে—ভাবনা-কামনা-কল্পনার অতীত জগতে।

সামনের চর ইস্‌মাইল। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নামিয়াছে।

এপারে সুপারি নারিকেল বীথিতে অশ্রান্ত উদ্দাম সঙ্গীত—ওদিকে নদীতে প্রখর কলোল্লাস। কূলভাঙা জোয়ার আসিয়াছে বোধ হয়।

রাত্রি বাড়িতেছে। যাহাকে (অথবা যাহাদের) ধরিবার জন্ম আজ রাত্রিতে তাহাদের অভিযান—সে এখন কী করিতেছে? হয় তো অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমেষ চোখ মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে। শৃঙ্খলিত সমস্ত দেশের বেদনা আর জমাট অশ্রু তাহার দৃষ্টির সামনে এমনি করিয়া নিজেকে মেলিয়া ধরিয়াছে বর্ষাকরুণ তমস্বিনী রাত্রির মতো। থাকিয়া থাকিয়া খর বিদ্যুতের চমকে তাহার দৃষ্টির সামনে ফুটিয়া উঠিতেছে—ভাবী স্বাধীন ভারতবর্ষের একটা অনাগত রূপ—জ্বালাময়, আগ্নেয়।

আর এমনি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে কোথায়? আগা খাঁ প্রাসাদের চারিদিকে কি বর্ষার মল্লার গানে নিপীড়িত দেশের কান্না বাজিয়া উঠিতেছে? ভারতের অর্ধনগ্ন মৌনব্রতী ফকিরও কি কালো আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে—এই রাত্রি সত্য নয়, এই অন্ধকারের পরপারে—

ঘর্-র্-র্—

রূঢ় কর্কশ শব্দ। মাথার উপর দিয়া এই বর্ষা রাত্রেও বিমান উড়িয়া চলিয়াছে—আসমুদ্র হিমালয় অতিক্রম করিয়া—অতলান্তিক, প্রশান্ত মহাসাগর, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বাধা-বন্ধনকে অসঙ্কোচে পার হইয়া বিজয়ের অভিযানে? ভারতবর্ষের অশ্রুভারাচ্ছন্ন আকাশ কি সে গতিকে বাধা দিতে পারে?

বিদ্যুতের আগুনে দিগ্ দিগন্ত চকিতে যেন জ্বলিয়া গেল। শুধু

অশ্রুভার নয়, বজ্রও বটে। একদিন জ্বলন্ত অগ্নি-বর্ষণে সেও নিজের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবে। কিন্তু সে কবে! এই সরকারী চাকরী, এই নিশ্চিন্ত জীবন—মণিমোহনের পক্ষেও কি সে দিনটি একান্তই বাঞ্ছনীয়?

লঘু পায়ের শব্দ। রাণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—খিচুড়ি হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

—না, শুয়ে পড়া চলবে না রাণু। বেরোতে হবে।

—বেরোতে হবে? এই রাত্তিরে কোথায়?

—সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। সরকারী চাকরী, দায়িত্ব বোঝো না?

বিষণ্ণভাবে হাসিয়া মণিমোহন উঠিয়া পড়িল। রাণী কাতর দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইল মেঘমন্থর দিগন্তের দিকে—তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

রাত বাড়িতেছে—তেমনি ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়া পড়িতেছে কালো আকাশ। পৃথিবীর অশ্রান্ত কান্না। চর ইস্‌মাইল ঘুমের চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে আচ্ছন্ন আবিষ্ট হইয়া। অবিরাম ঝিঁ ঝিঁর একতান—ব্যাঙের আনন্দ-মুখর কলধ্বনি।

অন্ধকারের মধ্য দিয়া পর পর তিনখানা নৌকা চলিয়াছে। গাজীতলার পাশ দিয়া, হাটখোলার মধ্য দিয়া, জেলে আর চাষী-দের বস্তিকে পাশে ফেলিয়া খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—ভাদ্রের ভরা উজানের স্রোত তাহারি মধ্যে বহিতেছে প্রচণ্ড কল্লোল তুলিয়া—কুটা ফেলিলে উড়াইয়া নিয়া যায়।

ভরা খালের তীক্ষ্ণ জোয়ারে তীরের মতো ছুটিয়াছে নৌকা। একটানা জলের শব্দ—মাঝে মাঝে আকস্মিক এক একটা বিরাম যতির মতো কাদার মধ্যে লগি ঝপাস ঝপাস করিয়া পড়িতেছে—নৌকার ছইকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াই আবার একটা বিশ্রী ছর্ ছর্ ধ্বনিতে পেছন ছিটকাইয়া পড়িতেছে বেতকাঁটা, নলখুরি ফুলের লতা। সুপারীর কাঠ ফেলা ছোট ছোট গ্রাম্য ঘাটে ঘূর্ণি বাজিতেছে।

দিগ্ দিগন্তে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া চলিয়াছে। আকাশটা যে অমন সহস্রভাবে ফুটি ফাটা হইয়া আছে—বজ্রের আলোয় সেটা যেন স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িতেছে। রাত্রে আবার প্রবল খানিক বর্ষণ নামিবে বলিয়া মনে হয়। এই দেশটা আশ্চর্য। বৈশাখ বলো, জ্যৈষ্ঠ বলো, যে মাসই হোক একবার বৃষ্টি নামিলেই হইল। তারপর আর কথাবার্তা নাই—হয়তো পর পর সাতদিন ধরিয়াই এতটুকু আলো ফুটিল না—রাশি রাশি মেঘ আর অসংলগ্ন বৃষ্টি চলিতে লাগিল সময় ও সীমানাহীন ছন্দে।

মণিমোহন ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বাহিরের জলকল্লোলে আর রাত্রির এই অনন্ত সজল তমসায় সে যেন হঠাৎ দশ বছর আগে ফিরিয়া গেছে। সেই যেদিন নদীতে অতিকায় জেলে ডিঙির মতো বড়ো বড়ো বালির চড়া ঠেলিয়া ওঠে নাই, যেদিন তেঁতুলিয়ার রোলিংকে সমুদ্রের তাণ্ডব বলিয়া মনে হইত; যেদিন মনে হইত পৃথিবীটা এখানে এখনো বিশ্বকর্মার কর্মশালার খানিকটা অবিন্যস্ত উপচার—সবটা মিলিয়া কিছুই

গড়িয়া ওঠে নাই—আদিম জগতের গলিত লাক্ষাস্তূপের উপরে সামান্য এতটুকু আবরণ পড়িয়াছে মাত্র। তারপর নদীতে চড়া পড়িল—চর ইস্‌মাইল আগাইয়া আসিল মানুষের কাছাকাছি —সভ্যতার নিকট সান্নিধ্যে। কী ঘটিল এবং কী যে ঘটিল না। এই অন্ধকার রাত্রে বিশাল নদী বাহিয়া এম্‌নিই একটা যাত্রা মনে পড়িতেছে—সেই যেদিন—। সীমাহীন চিহ্নহীন আকাশ বাতাসে আজকের চর ইস্‌মাইল দশ বছর আগেই আবার ফিরিয়া গেল নাকি!

চোখ দুইটা ঝিমাইয়া আসিতেছে—মনে হইতেছে ডাক-বাংলোয় পাতলা একখানা লেপ মুড়ি দিয়া রাণী এখন ঘুমাইতেছে বোধ হয়। আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে অচেতন স্বপ্নছায়ার মতো থাকিয়া থাকিয়া দুইটা রাইফেলের নল চক চক করিয়া উঠিতেছে না:—সেদিন আর এদিনের পৃথিবী এক নয়।

ঘস্‌-স্‌ করিয়া নৌকা ভিড়িয়া গেল হঠাৎ। একটা টর্চের আলো মণিমোহনের মুখের ওপর ঝল্‌সাইয়া উঠিল—নিদ্রার আমেজটা ভাঙিয়া গেছে।

চাপা গলায় দারোগা ডাকিতেছে: স্যার?

—কী খবর?

—এসে পড়েছি—উত্তেজনায় দারোগার গলা কাঁপিতেছে।

অনিচ্ছুক শরীরটাকে নাড়াচাড়া দিয়া মণিমোহন উঠিয়া বসিল।—নামতে হবে?

—আপনি একটু ওয়েট্ করুন স্যার। ওদিকের ব্যবস্থা করে আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।

—আচ্ছা—মণিমোহন আবার গা এলাইয়া দিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজিল। কাদার উপর আট দশ জোড়া বুটের ছপাছপ শব্দ এবং তিন চারটি টর্চের জোরালো আলো সুপারী বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

রাত বোধ হয় দেড়টার কাছাকাছি। চোখ হইতে ঘুমের জড়তাটা কিছুতেই কাটিতেছে না। বোটের মাঝিরা ফিসফাস করিয়া কী বলিতেছে—কথাগুলা ভালো করিয়া শোনাও যায় না—বোঝাও যায় না। নৌকার তলা দিয়া জলের সুতীব্র শব্দ। এতক্ষণ যার অস্তিত্ব কিছু আছে বলিয়াই মনে হয় নাই, সুযোগ পাইয়া সেই মশার ঝাঁক আসিয়া চারদিক হইতে গুঞ্জন তুলিয়াছে। কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত চেতনা যেন একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের পাখায় ভাসিয়া চলিয়াছে; ঝিণ্টু, রাণী—কলিকাতার চৌরঙ্গী—সাউদার্ণ অ্যাভিনিয়ের কৃত্রিম চন্দ্রালোক; হা হা করিয়া বিশ্রী চেহারার একটা রোগা হাড় জিরজিরে লোক প্রবল ভাবে হাসিয়া উঠিল: কে, সেই পাগলা পোষ্ট মাষ্টারটা? এখনো বাঁচিয়া আছে নাকি—এই দশ বৎসর পরেও?

আবার চমক ভাঙিল। পোষ্ট মাষ্টার নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। যামঘোষ। প্রহর ঘোষণা করিতেছে তারস্বরে। জলের শব্দ, ব্যাঙের ডাক—মাঝিরা তামাক খাইতেছে।

পকেট হইতে সিগারেটের টিনটা বাহির করিতে গিয়া

মণিমোহন আবার ঝিমাইয়া পড়িল। স্বপ্নের মধ্য দিয়া একটা ঝড়ের রাত বহিয়া চলিয়াছে। অন্তরে ঝড়, বাহিরে ঝড়। আরণ্য আর উদ্দাম ভালোবাসা। মশার গুঞ্জন নয়—গুন্ গুন্ করিয়া কে যেন কাঁদিতেছে—কাঁদিতেছেই—নৌকার ছইয়ের উপর টপ টপ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে—রাণী ?

—স্যার ?

এবার আর ডাক নয়—কাণের কাছে ব্যাকুল আর্তনাদের মতো সুরটা ঝনাৎ করিয়া হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাওয়া সেতারের তারের মতো বাজিয়া উঠিল। ছন্দোপতন।

—স্যার, ঘুমুচ্ছেন ?

ইহার পর আর ঘুমানো চলে না। বিস্ফারিত বিহ্বল চোখ দুইটাকে মণিমোহন এক সঙ্গেই মেলিয়া দিল : কী হয়েছে—অমন হাঁক ডাক কেন ?

—সর্বনাশ হয়েছে স্যার।

—সর্বনাশ ? কিসের সর্বনাশ ? ডাকাত পড়েছে নাকি ?

—ডাকাত পড়লেও তো ভালো হত স্যার—মণিমোহনের মনে হইল দারোগা যেন বুক ফাটিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন : সব মাটি স্যার—কিছু হল না। পাখী পালিয়েছে। একেবারে ফুড়ুৎ।

যাক—আপদ গিয়াছে। বড় করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল মণিমোহন, কিন্তু দারোগার ব্যাকুল চোখ মুখের দিকে তাকাইয়া মায়া হইল অত্যন্ত।

অপচয়টা তাহার পছন্দ হইল না। ইঁদুরের মতো হুঁশিয়ার পা ফেলিয়া রাধানাথ ঘরে ঢুকিল, তারপরেই গড়গড়ার মাথা হইতে কল্‌কেটা তুলিয়া লইয়া আবার নেপথ্যে তিরোহিত হইল।

—কবিরাজমশাই, কবিরাজমশাই!

ডি-ক্রুজার আকুল কণ্ঠ!

—কী রে, এমন অসময়ে কী ব্যাপার?

—শীগ্‌গির আসুন।

—কী হয়েছে?

—বাবার অবস্থা ভারী খারাপ।

—ভারী খারাপ? কেন—কী হয়েছে? বিকেলে দেখে এলাম, দিব্যি আছে, জ্বর নেই—এর মধ্যে আবার কী হল?

—আমি জানি না, আপনি আসুন।

—আঃ—এই রাত্তিরে জল-কাদার মধ্যে হাড় জ্বালিয়ে মারলি! আচ্ছা, চল। কিন্তু ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমিও না।—ক্রুজা কাঁদিয়া ফেলিল: আপনি চলুন। শীগ্‌গির চলুন।

চটি পরিয়া এবং মসীম্লান লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। এমন রাত্রে ঘর হইতে বাহির হইয়া রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া থাকিতে কাহার ইচ্ছা করে? অন্ধকার বনবীথিকে আলোড়িত করিয়া এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। টিপ টিপ করিয়া বর্ষাধারার ক্ষণবর্ষণ। পায়ের নীচে জল আর কাদা

ছপছপ করিতেছে, ঘাসে ঘাসে জোঁক নড়িতেছে। চর ইস্‌মাইল নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে, বলরামও নিঃসংশয় হইয়াই ঘুমাইতেছিলেন। কিন্তু এ বিড়ম্বনা আসিয়া দেখা দিল!

মনে মনে বলরাম সমস্ত পৃথিবীটাকে গালাগালি করিতেআরম্ভ করিয়া দিলেন। আরো বেশি করিয়া রাগ হইতেছে ভুঁড়ো ডি-সিল্‌ভার উপরে। সুস্থ থাকিয়া লোকটা পৃথিবী শুদ্ধ লোককে জ্বালাইয়া বেড়ায়, অসুস্থ অবস্থাতেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। মরিতে হয় তো সোজাসুজিই চোখ দুইটা উল্‌টাইয়া বসিয়া থাক বাপু, এমন ভাবে মানুষকে উদ্বাস্ত করা কেন? এই পর্তুগীজ-গুলাই দুনিয়ার অনাসৃষ্টি জীব—যেমন নাম, তেমনি আকার প্রকার, আর তেমনিই ব্যবহার। মরিয়া মরিয়া তো প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দু-চার ঘর যা আছে সেগুলি গেলেও আপদের শাস্তি হয়। নিজের মনেই গজ্‌রাইতে গজ্‌রাইতে বলরাম ডি-সিল্‌ভার বাড়িতে আসিয়া পা দিলেন। আর আসিয়া যে কাণ্ডটা চোখে পড়িল তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—এ কী রে! কেমন করে হল?

—আমিও জানি না। বাড়ীতে এসেই দেখি—

—এত রাত কোথায় ছিলি?

ক্রুজা নিরুত্তর। কোথায় বদমায়েসী করিতে গিয়াছিল নিশ্চয় —একেবারে পুরাপুরি বখিয়া গিয়াছে হতভাগা ছেলে। কিন্তু এ কী ব্যাপার।

মেজেতে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে ডি-সিল্‌ভা। চারদিকে

রাশি রাশি ভাঙা শিশি-বোতল, ঘরময় কাঁচের টুকরা। কতগুলা বাক্স প্যাঁটরা খোলা—এলোমেলো আর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আছে সমস্ত। সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া, মেঝে একাকার করিয়া ডি-সিল্‌ভা বমির বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। সে বমি রোগীর নয়—মাতালের। মদের এবং ক্লেদের একটা দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী যেন উলটাইয়া আসিবার উপক্রম করে। বড় বড় হিক্কা উঠিয়া ডি-সিল্‌ভার আপাদ মস্তক ঝাঁকিয়া দিতেছে—মনে হইতেছে আর দেরী নাই, বড় জোর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ঝামেলা বেমালুম মিটিয়া যাইবে।

ঘৃণা কুঞ্চিত বলরাম ঝুঁকিয়া পড়িলেন রোগীর উপরে। নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। পিছনে আশঙ্কা-পাণ্ডুর মুখে জুব্জা নীরব আর নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়া।

—কিচ্ছু হয় নি। খালি পেটে একরাশ কড়া মদ টেনে এই অবস্থা হয়েছে।

—মদ!

—নিশ্চয় মদ। কেন মদ দিলি এনে?—বলরাম ফাটিয়া পড়িলেন: এই রোগী মানুষকে মদ খাওয়ালি কোন্ আক্কেলে? এখন যে বাপ মেরীর পাদপদ্মের দিকে রওনা হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছিস হতভাগা বেকুব কোথাকার।

—আমি—আমি তো মদ আনি নি।

—তবে? মদ এলো কোত্থেকে? আশমান থেকে পাখা মেলে উড়ে আসতে পারে না তো।

—বোধহয় মামা।

—মামা!—বলরাম সবিস্ময়ে বলিলেন, তোর আবার মামা কে?

—তা তো জানি না। আজই এসেছে—

—চুলোয় যাক। যেমন হতভাগা ভাগনে, তেমনি হতভাগা তার মামা। যা এখন জল আন্—দৌড়ো, দৌড়ো। মাথায় জল দে—

তারপর আধঘণ্টা ধরিয়া পরিচর্যা চলিল। মাথায় জল, পাখার বাতাস। আস্তে আস্তে ডি-সিল্‌ভার নিশ্বাস সহজ আর স্বাভাবিক হইয়া আসিল—মনে হইল এইবারে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

—নে, এইবারে বুড়োকে খাটের ওপরে তুলে ফেল। এর পরে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ধরাধরি করিয়া দুজনে ডি-সিল্‌ভাকে খাটে তুলিল। ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে একটা বড়ি বাহির করিয়া বলরাম বলিলেন, জ্ঞান হলে এটা খাইয়ে দিস। আর ভালো কথা, আর তোর মামা ধুরন্ধরটি গেলেন কোথায়?

—জানি না তো।

—বেশ মামাটি বটে। বোনাইকে এক পেট মদ গিলিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু ঘরের এমন অবস্থা কেন রে? বাক্স প্যাটরা ভাঙা—জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌—

—হ্যাঁঃ!

জুজা এতক্ষণে চমকিয়া উঠিল: তাই তো। চোর এসেছিল নাকি? মামাই বা গেল কোথায়?

বলরাম বলিলেন, হুঁ। চোর যে কে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। বেশ মামাটি জুটিয়েছিলে বাবাজীবন। বাপটিকে মারবার মতলব করে জিনিস-পত্তর হাতিয়ে সে নিরাপদে একদম পলায়মানঃ।

কুজা আবার বলিল, অ্যাঃ!

—হ্যাঁ। কোনো সন্দেহ নেই। পারিস তো পুলিশে খবর দে—আমি আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী করব। যত সব—হুঁঃ!

ব্যাগটি ভুলিয়া লইয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। আর আমাকে সাক্ষী-টাক্ষী মানিস্ নি বাপু, পুলিশের হাঙ্গামা আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

বলরাম লণ্ঠন হাতে অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেলেন।

মড়ার মতো মুখ লইয়া কুজা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। উঃ মামা—মামার পেটে পেটে এই মতলবই ছিল তাহা হইলে—অত করিয়া একটা টাকার ঘুষ তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিল তবে এই জন্তই। আর ওদিকে ডি-সিল্‌ভা অঘোরে ঘুমাইতেছে। যেন কিছুই হয় নাই—ঠিক এই ভাবেই তাহার নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত বড় বড় শ্বাস বহিতেছে।

অকারণ একটা হিংসায় কুজার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল এখনি সে ঝাঁপ দিয়া ডি-সিল্‌ভার ঘাড়ের উপরে গিয়া পড়ে—কামড়াইয়া, আঁচড়াইয়া খামচাইয়া তাহার একাকার করিয়া দেয়। কুজার পায়ের গুঁতা লাগিয়া একটা মদের শূন্য বোতল ঘরময় গড়াইয়া গেল।

কিন্তু গঞ্জালেস্ তো ঠিকই করিয়াছে। কালো অন্ধকারে—বৃষ্টির অশ্রান্ত কান্নার ভিতর দিয়া তাহার নৌকা নদীতে পাড়ি ধরিয়াছে। তীব্র নেশায় উদার এবং উদাস হইয়া হেঁড়ে গলায় গান জুড়িয়াছে গঞ্জালেস্। আশ্চর্য—সে তো গান নয়, প্রার্থনা। মাতা মেরীর পবিত্র নাম কীর্তনে নদীর বুক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে পুলকে এবং আধ্যাত্মিক আনন্দের প্রেরণায়।

নেশার ঝোঁকে সে চর ইস্মাইলে আসিয়াছিল এবং নেশার ঝোঁকেই আবার নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ডেভিড্ গঞ্জালেস্ জাগিয়াছে তাহার রক্তে। কী হইবে একটা মেয়ের জন্য অকারণে বিলাপ করিয়া, নিজের সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া? পৃথিবী অনেক বড়ো—পৃথিবীতে অনেক মেয়ে। একজনকে যদি নাই পাও, তাহার প্রতিনিধি হিসাবে আরো দশজনকে আয়ত্ত করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া আনা এমন কিছু কঠিন কথা নয়। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে—নির্মম ভাবে ভোগ করিয়া যাও—নিষ্ঠুর ভাবে আদায় করিয়া লও। এই অত্যন্ত সার কথাটা তাহার বাবাই খুব ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। সে কাহারও জন্য প্রতীক্ষা করে নাই—ইনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করে নাই—একটি নারীর জন্যে কাজ কর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত মাতালের মতো দিকে দিগন্তে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় নাই। অক্লেশে ডাকাতি করিয়াছে, বন্য যৌবনকে চরিতার্থ করিয়াছে—খুন করিয়াছে, বীরের মতো বাঁচিয়াছে এবং বীরের মতো মরিয়াছে। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের আদর্শ সন্তান।

তবে সেই বা পিছাইয়া থাকিবে কেন? পর্তুগীজ চিরদিনই পর্তুগীজ—চিরকালই সে যুদ্ধ করিয়াছে এবং জয় করিয়াছে। পেরিয়া নয়—অনুগৃহীত সেই বাঙালি মেয়েটা নয়—ঘুমন্ত শান্ত কর্ণফুলীর তীরে নারিকেল-বীথির মৃদু-মর্মরও নয়। অন্তহীন নীল সমুদ্র। ড্রাগন আর মড়ার মাথা আঁকা কৃষ্ণ পতাকা। কামানের অগ্নিপিণ্ড দিয়া বাণিজ্য জাহাজকে অভ্যর্থনা। জ্বলন্ত সপ্তগ্রাম—দীপময় দুর্গ। যোগ্যতমের উদ্বর্তন।

পরস্বাপহরণে এই হাতে খড়ি। নতুন করিয়া জীবন সুরু হইল গঞ্জালেসের। কোনোখানে বাঁধা পড়িয়া নয়—পৃথিবীময় ছড়াইয়া। নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা উল্লাস তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—কালো রাত্রির কালো স্রোত দৃষ্টির অগোচরে বিশাল পৃথিবীর মহা আবর্তে তাহাকে লীন করিয়া দিল—আরো অনেক বিদ্রোহী শিশুর মতোই চর ইসমাইল আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না কোনোদিন।

## নয়

চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়া সূর্য উঠিল।

এক একটি রাত্রির কালো অন্ধকার দিগন্ত-প্রসারিত নদীর বুক হইতে নিজেকে বিকীর্ণ করিয়া দেয়—আবার প্রভাতের প্রথম আভাসে রহস্যময় অতলস্পর্শ জলের তলায় বিলীন হইয়া যায়। রক্ত-সমুদ্রে স্নান করিয়া নিজেকে প্রকাশিত করে প্রতিদিনের সূর্য—নবজাতক সূর্য। বিস্ময়-ব্যাকুল চোখ ফেলিয়া সেই সূর্য যেন নতুন করিয়া দেখিতে চায় পৃথিবীকে, যেন সত্তার মধ্যে অনুভব করিতে চায় বিস্মৃত আদিম কালের সেই প্রথম অগ্নিস্রাবী দিনগুলি, যেদিন মাটি ছিল না, জল ছিল না, শ্যামশ্রীর আনন্দিত বিস্তার ছিল না—প্রাণে-শস্যে সমুজ্জল মানুষের উপনিবেশ ছিল না। আকাশ বাতাস, পঞ্চভূতের বুকের মধ্যে শুধু ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল সোনা, লোহা, গন্ধক, সোরা, লাক্ষা, লাভা, হাইড্রোজেন, কার্বন—আরো কত কী।

সূর্য স্বপ্ন দেখে, কিন্তু পৃথিবী সে স্বপ্ন ভুলিয়া গেছে বহুদিন আগে। তার মুগ্ধ চোখে আবিষ্ট হইয়া আছে আকাশের নীলাঞ্জন মায়া—তার সর্বাঙ্গে শ্যামলতার স্নিগ্ধ সৌকুমার্য উঠিতেছে হিল্লোলিত হইয়া, তার চেতনায় নব নব সৃষ্টির রোমাঞ্চকর স্বপ্নমাধুর্য। সূর্যের দিনে পৃথিবী আর ফিরিবে না, আদিম আগুনের

নীল ধাতব শিখায় নিজেকে আর জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে না সে। তার ভবিষ্যৎ হিম-মজ্জিত কোন্ লক্ষ লক্ষ বৎসরান্তের শীতল তুষার শয্যায়, সূর্যহীন অন্ধকারে, রেডিয়াম-ইউরেনিয়ামের ক্রম-ক্ষয়শীল অন্তর্দীপ্তিতে।

তবুও সূর্য ওঠে—নবজাতক সূর্য। সদ্যোজাগ্রত চোখ মেলিয়া তাকায় পৃথিবীর দিকে, তাকায় চর ইস্‌মাইলের দিকে। আর উপনিবেশের অর্ধ-পরিণত মৃৎ-স্তরের নীচে আদিম লাভা ফুটিয়া, ফুলিয়া, ফুঁসিয়া উঠে—বৈষম্য-কণ্টকিত, বিরোধ জর্জরিত অলস শান্তির তলা হইতে একটা উত্তাল আগ্নেয় আক্ষেপ যেন অমার্জিত মানুষগুলির শিরা-স্নায়ুতে নিজেকে সঞ্চার করিতে চায়।

উপনিবেশের বুকে মন্বন্তর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদপাত। উনিশশো বিয়াল্লিশের আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। অকাল-বোধনের পূজায় ব্যর্থ-বলির রক্তপাত। শতধাবিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ প্রাণশক্তি পথ খুঁজিয়া পায় না, পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলে।

বিস্ময়-ব্যাকুল চোখ মেলিয়া তাকায় রক্তাক্ত সূর্য। আগ্নেয় অতীত আবার কি নিজেকে সঞ্চারিত করে ভবিষ্যতের মধ্যে? উপনিবেশের পেশীতে পেশীতে মত্ততার জোয়ার আসে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের রক্তে ডাক আসে নতুন কালের ধারা বাহিয়া—কিন্তু সে কি দস্যুতার, না দস্যুর মতো সঞ্চিত মিথ্যাকে লুঠ করিয়া নিতে? আরাকানীর তলোয়ার আবার মাটির তলা হইতে

ফিরিয়া আসে কি অত্যাচার করিবার জন্য, না অত্যাচারীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য ?

সূর্য প্রতীক্ষা করে।

*  *  *  *

—বড়মিঞা, ও বড়মিঞা ?

বড়মিঞার কাছারী বাড়ীর টিনের দরজাটা বাহির হইতে শক্ত করিয়া তালা আঁটা। ধুলা জমিয়াছে, মাকড়সার জাল ছড়াইয়া আছে। লোহার তালাটা বহুদিন খোলা হয় না, অনেক রোদে পুড়িয়া এবং অনেক জলে ভিজিয়া সেটা যেন স্বর্গের তালার মতো কঠিন এবং সুদৃঢ় হইয়া আছে, তাহার অভ্যন্তরে নিহিত রহস্যের আবরণ ভেদ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। ভাবটা এই রকম, এখানে মানুষ নাই, এখানে কাহারো থাকিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। যে জন্য তোমরা এখানে মাথা কুটিয়া মরিতেছ তাহা বৃথা—ধান চালের ব্যাপার বড়মিঞা বহুকাল আগেই ছাড়িয়া দিয়াছে, সুতরাং তাই লইয়া এখানে দরবার করিতে আসা যেমন অনাবশ্যক তেমনই অবান্তর।

কিন্তু মানুষগুলিও নাছোড়বান্দা।

—বড়মিঞা, ও বড়মিঞা।

বন্ধ কাছারী বাড়িটার ভিতর কেমন যেন রহস্যময় একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। মানুষ ?—না, শেয়াল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বাহিরে প্রায় পঞ্চাশজন লোক জুটিয়াছে। তাহাদের হাতে লাঠি এবং ধারালো নিড়ানি। চর ইস্‌মাইল, কালুপাড়া এবং অন্যান্য আরো দশখানা গ্রামের একদল মুসলমান চাষা। দেশের চাল লোপাট হইয়া গিয়াছে—একটি দানাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না কোনোখানে। অথচ শোনা যায় রাত্রে যখন অন্ধকারে গাঙ থম থম করে, গ্রামের মানুষগুলি তো দূরে থাক, সদাসতর্ক প্রহরী কুকুরদের চোখও ঘুমে এলাইয়া আসে—তখন, ঠিক তখন—কাকপক্ষীও যখন টের পায় না, আর সুপারীর পাতাগুলি পর্যন্ত নড়ে না, ঠিক সেই সময় দশ দাঁড়, পনেরো দাঁড়, বিশ দাঁড়ের পান্‌সী গাজীতলার হাট হইতে বাহির হইয়া গির্জাঘাটের নীচ দিয়া বড় নদীতে পড়িয়া শাঁ শাঁ শব্দে তীরের মতো অদৃশ্য হইয়া যায়। কোথায় যায়? যায় ওপারের গঞ্জে। কেন যায়? লুকাইয়া লুকাইয়া দেশের প্রাণ, মানুষের পেটের খাবার বিক্রী করিয়া আসিতে।

এই কাজের চক্রী হইতেছে বলরাম ভিষক্‌রত্ন এবং তাহার দক্ষিণ হাত মজাঃফর মিঞা। সুতরাং চর ইস্‌মাইলের রক্তে আগুন ধরিয়াছে। এ কলিকাতা নয় যে এখানকার মানুষ নির্বিবাদে ফুটপাথে পড়িয়া তিলে তিলে শুকাইয়া মরিবে, মাটির মাল্‌সা হাতে লইয়া দরজায় দরজায় 'ফ্যান্' 'ফ্যান্' করিয়া কাঁদিবে এবং কাঁকাইবে, ডাষ্টবিনে হাত ডুবাইয়া পচা শস্যের কণিকার ব্যর্থ সন্ধান করিবে, অথবা সরকারী লরীর তলায় পড়িয়া দিব্যগতি লাভ করিবে। এরা দাবী করিতে জানে, নিজেদের প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা

করিতে জানে। এরা আইন গড়ে, আইন ভাঙে। আর অবশ্য সহরের তৈরী অনেক বিষ বাষ্প আসিয়া এদের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু মারিয়া ফেলিতে পারে নাই—সহজ স্বাভাবিক জটিলতাহীন সমবায় ও সাম্যবাদ এখনো ইহাদের সুস্থ কর্তব্যবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে।

টিনের দরজায় ঠক ঠক করিয়া তাহারা লাঠি ঠুকিতে লাগিল।

—বড়মিঞা, বড়মিঞা—শুনছ ?

তবু সাড়া নাই। মৃত্যুপুরীর মতো সব স্তব্ধ? শুধু সামনে নদীর সাদা জলে জোয়ার আসিয়াছে—উদ্দাম বাতাসে একটা তীব্র কলধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে ?

—ও জমির ভাই, ব্যাপার কী ?

—এখানে তো কেউ নেই মনে হচ্ছে।

জমিরের চোখে আগুন জ্বলিতেছিল।

—নেই মানে? সব চালাকি। এমন করে রেখেছে যে লোকে ভাববে ভেতরে কিছু নেই। আসলে সব লুকিয়ে রেখেছে এই গোলার মধ্যেই—রাতের বেলায় এর ভেতর দিয়ে ধান বেরিয়ে যায়।

—কিন্তু বড়মিঞা গেল কোথায় ?

—আছে ভেতরেই। নিজের চোখে আসতে দেখেছি লাঠি ধরে, বাঁকা বাঁকা পা ফেলে। জিন পরী তো আর নয়—জলজ্যান্ত একটা মানুষ। হাওয়ায় নিশ্চয় উড়ে যায় নি।

একজন গর্জন করিয়া কহিল, ভাঙো দরজা।

—সে কি। বে আইনি হবে যে।

—আইন।—জনতার মধ্য হইতে অনেকগুলি গোখ্‌রো সাপের রোষধ্বনির মতো একটা চাপা শব্দ উঠিল। আইন!

জমির আগাইয়া আসিয়া দরজায় প্রকাণ্ড একটা ঘা দিল: রেখে দাও আইন। ওই তো সার্কেল-অফিসারবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। কী করলে? কিছুই না। ও সব একদলের। যা করবার আমাদেরই করতে হবে ভাই, কারো মুখের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে পড়ে থাকলে হা পিত্যেশ করাই সার হবে।

—ভাঙো দরজা।

দু একজন লাঠি উদ্যত করিল, কিন্তু বেশীর ভাগই দাঁড়াইয়া রহিল দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া। ঘুণ ধরিয়াছে চর ইস্‌মাইলের বিদ্রোহী শরীরে। সংশয় দেখা দিয়াছে, আইনের তর্ক উঠিয়াছে। অনর্থক ফ্যাসাদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে কোথায় যেন বাধে।

জমির ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—তোমরা মানুষ না?

জনতা শক্ত হইয়া উঠিল। চোখে আগুন চমকাইয়া গেল। কিন্তু এখনো মন তৈরী হয় নাই, চেতনার উপর হইতে নতুন-শেখা ন্যায় অন্যায়ের ভারগ্রস্ত সংশয়টা কিছুতেই নামিয়া যাইতেছে না।

জমির বলিল, সামনে কী হচ্ছে দেখেও কি দেখতে পাও না? জমিরদ্দি মোল্লার পরিবার তিন দিন ধরে উপোস দিচ্ছে। মণিরুদ্দিনের ছেলেবউ বিনা চিকিৎসায় না খেয়ে মরে গেল।

জেলেপাড়ায় মানুষ মরছে টপাটপ করে। কেন? দেশে কি চাল নেই। এত ধান হয়েছে আমাদের চরের জমিতে, আঁচলভরা সোনা ফলেছে। কোথায় গেল সে সব, কারা নিলে?

জনতা নড়িয়া উঠিল।

—ওই কবিরাজ, এই মজঃফর মিঞা, ওই ওপাড়ার মুরুল গাজীর ব্যাটারা, জয়নাল ব্যাপারী। সব খবর এরাই জানে। দেশের লোককে প্রাণে মেরে পেট বোঝাই করছে। মাটির তলায় তলায় ধান, অন্ধকার গোলাঘরে ধান। রাতে ছিপ্‌ নৌকোতে চালান দেওয়া ধান। আর তোমরা পড়ে পড়ে মরবে? মানুষ না গোরুর দল?

—কড়্‌—ঝনাৎ—ঝনাৎ—

টিনের দরজাটা যেন একটা বিরাট ভূমিকম্প অথবা প্রলয়ের আঘাতে নড়িয়া উঠিল। চর ইস্‌মাইলের আকাশ ফাটাইয়া রণধ্বনি মুখরিত হইল: আল্লা—হু—আকবর। ভাঙো দরজা।

কাছে দূরে লোকে জমিতে সুরু হইয়াছে। কতক বা ভীত বিহ্বল চোখে চাহিয়া আছে, কতক বা লাঠি সোঁটা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া এদের দলে যোগ দিল। অভাব সকলের, দুঃখ সকলের, নির্যাতনের অংশও সকলের সমান। তাই প্রতীকারের দায়িত্বও সকলেই এক সঙ্গে ভাগ করিয়া নিতে চায়।

—আল্লা হু আকবর—দরজা ভাঙো—

আকাশ কাঁপিতেছে, পায়ের তলায় মাটি কাঁপিতেছে, চর ইস্‌মাইলের নিভৃত নিম্নলোকে প্রচ্ছন্ন অগ্নিগিরির লাভা স্রোত

ফেনাইতেছে। ধান কাটা লইয়া, জমি লইয়া লাঠালাঠি করা, রক্তের ধারা বহাইয়া দেওয়া ইহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ইতিহাস, কিন্তু এমন করিয়া এক হইয়া দাঁড়ানো, এমন করিয়া মাথা তুলিয়া সমস্ত অন্যায়কে চুরমার করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা—কোন্ নতুন যুগের হাওয়া আজ চর ইস্মাইলের বুকে বহিয়া আনিল!

দূরে কাছে লোকগুলির মধ্যে নেশা লাগিতেছে। তাহারা আর নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র নয়, নিজেদের ভাগ্যও যে এর সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত, সেই সত্যটাকেও অনুভব করিতেছে।

—ভাঙো—ভাঙো—সাবাস্—

—মড়্—মড়্—মড়াৎ—

একটা প্রচণ্ড লাথিতে শক্ত হুড়কাটা দু টুক্‌রা হইয়া গেল—কপাটটা হাট আদুড় হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। সামনের লোকটি মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল, তারপর হু হু করিয়া ওরা জলস্রোতের মতো ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

কাছারী ঘরে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। কতগুলি বেঞ্চি এদিকে ওদিকে পাতা, একটা পুরাণো ভাঙা খাট। লাঠির মুখে সেগুলিকে চুরমার করিয়া তাহারা উঠোনে নামিয়া আসিল।

সামনে চার পাঁচটি গোলা সাজানো। মসৃণ করিয়া মাটি দিয়া তাহাদের দেওয়াল লেপা, তাহাদের মাথায় নতুন খড়ের সোনালি ছাউনি। সামনে দিয়া ধানের সরু সরু বিশৃঙ্খল রেখা পিছন দিকের ছোট দরজা বরাবর চলিয়া গেছে। ওই পথ দিয়াই তাহা হইলে ধান বাহির হইয়া যায়!

কিন্তু বিস্ময়ের বাকী ছিল তখনো।

ক্ষিপ্তের মত মানুষগুলি ধানের গোলায় গিয়া চড়াও হইল। সেখানে যাহা চোখে পড়িল তাহাতে বাক্‌স্ফূর্তি হইল না কাহারো। ধান তো দূরের কথা, একটি তুষের দানাও পড়িয়া নাই সেখানে। পরিষ্কার করিয়া ঝাঁট দিয়া কে যেন শেষ শস্যকণাটি অবধি তুলিয়া লইয়া গেছে। শুধু একটি গোলাই নয়—সব কয়টির এক অবস্থা।

কয়েক মুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা। কাহারো মুখে একটি মাত্রও শব্দ নাই।

যে অলক্ষ্য ইঁদুর মাটির তলায় থাকিয়া নীরবে দিনের পর দিন দেশের প্রাণসত্তার উজাড় করিয়া লুটিয়া খাইয়াছে, এ যাত্রাও তাহার হিসাবে ভুল হয় নাই। সময় থাকিতেই সে নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে তাহার কাজ গুছাইয়া লইয়াছে।

লোকগুলি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পরে আবার যেন প্রচণ্ড বন্যার বাঁধ ভাঙিল। হতাশার হাহাকার—নিরুপায় ক্ষোভের উন্মাদগর্জন।

—ধান কই, ও জমির মিঞা, ধান কই ?

—ফাঁকি দিয়েছে বুড়োমিঞা, রাতারাতি সব সরিয়েছে।

—ধান লুকিয়েছে—সব চালাকি।

—ধান কই, আমাদের ধান ?

মার্ মার্ শব্দে সব তচনচ করিয়া গোলাগুলি সমস্ত গুঁড়াগুঁড়া করিয়া দিল জনতা। টিন, কাঠ, বাঁশ—যেখানে যে যা পাইল

তুলিয়া লইল। তারপরে যেটুকু বাকী পড়িয়াছিল, একত্র করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

শুধু মজাঃফর মিঞার কাছারী বাড়িতেই আগুন লাগিল না। চর ইস্‌মাইলেও আগুন জ্বলিল। আদিম পৃথিবীর আত্মগ্রাসী আগুন নয়, নতুন যুগের হোমাগ্নি। মাথার উপরে চর ইস্‌মাইলের রক্তাক্ত সূর্য চাহিয়া রহিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

গতিকটা অবশ্য আগেই বুঝিতে পারিয়াছিল মজাঃফর মিঞা। রাতারাতি ধান সে সরাইয়াছিল—পাকা খবর যথাসময় পাইয়াই। কিন্তু এতটা যে ঘটিবে তা সে অনুমান করিতে পারে নাই। বাহিরের দরজা যখন প্রচণ্ড শব্দে ভাঙিয়া পড়িল তখন প্রমাদ গণিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া খিড়কির পথে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু পালানোর পথ নাই। মারমূর্তি মানুষ চারদিক হইতেই অন্ধ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাকে হাতে পাইলে আর আস্তো রাখিবে না। গুঁড়ি মারিয়া সে একটা ভাঁটফুলের ঝোপের মধ্যে বসিয়া পড়িল, তারপর ভয়ার্ত বন্যজন্তুর মতো চোখ মিটমিট করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল শ্রাদ্ধ কতদূর পর্যন্ত গড়ায়। বুকের মধ্যে ভয়ে সন্দেহে প্রাণপিণ্ড দুইটা হাপরের মতো শব্দ করিতে লাগিল, যদি একবার ওরা তাহাকে ধরিতে পারে—

কিন্তু ধরিতে পারিল না। মানুষগুলির নজর তখন মজাঃফর মিঞার দিকে নয়, ধানের দিকে। ব্যর্থ ক্ষোভে আর ক্রোধে গর্জন

করিয়া তাহারা সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিল, তারপর মজাঃফর মিঞার চোখের সামনেই তাহার এত সাধের কাছারী বাড়িতে—

মজাঃফর মিঞার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। সত্তর বছরের সীমানা ছাড়াইয়া পাড়ি দিয়াছে বয়েস। চলিতে পা কাঁপে, সর্বাঙ্গ টলিয়া ওঠে—নিজের উপরে নিজের কর্তৃত্ব নাই। দন্তহীন মুখের মাংসপেশীগুলি অনবরত নড়িয়া নড়িয়া যেন সে যা বলিতে চায় তাহারি প্রতিবাদ করে। সুতরাং ভাঁটফুলের জঙ্গলের মধ্যে সদ্য খোলস ছাড়া একটা বিষধর সাপের মতো বুক পাতিয়া সে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। শুধু মনে হইতে লাগিল, যদি আর দশবছর আগে হইত, তাহা হইলে—

আগুন জ্বলিতেছে, মাটির দেওয়াল ধ্বসিতেছে—শোঁ শোঁ করিয়া উড়িতেছে জ্বলন্ত টিন। সঙ্গে সঙ্গে জনতার উৎকট উল্লাস। সমস্ত চর ইস্মাইল আজ এক হইয়াছে—এক হইয়াছে আজ মজাঃফর মিঞার বিরুদ্ধে, মজাঃফর মিঞার মতো আরো যাহারা আছে তাহাদের সম্মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

জ্বলন্ত টিন উড়িতেছে—শাঁ শাঁ করিয়া উড়িতেছে বল্টু। আর সেই সঙ্গে যেন মজাঃফর মিঞার বুকের মধ্যেও কী একটা উড়িয়া যাইতে লাগিল। দাঁতে দাঁতে তাহার নিষ্ঠুর হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে। শোধ লইবে, ইহার শোধ লইবে সে। এখন আর সেদিন নাই। থানা আছে, আইন আছে, সরকারের কঠিন

শৃঙ্খলের শৃঙ্খলা আছে। সব কিছুর বিচার সেখানে হইবেই—কেহ তাহা রোধ করিতে পারিবে না।

মজাঃফর মিঞা বাহির হইয়া আসিল। জনতা এতক্ষণে দূরে চলিয়া গেছে—অন্য কোথাও কিছু একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাইবার জন্যই বোধ হয়। হাতের লাঠিটা তুলিয়া লইয়া ঠুক্‌ঠুক্ করিতে করিতে সে অগ্রসর হইল—তাহার মাথার মধ্যে আকাশটা তখন এতটুকু হইয়া গিয়া গোলাকার একটা অগ্নিচক্রের মতো ঘুরিতেছে।

## দশ

মণিমোহন তখনও যেন সম্মোহিত হইয়াই আছে।

স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি? দেখিতেছে অসংলগ্ন খেয়াল? দশ বছর আগে যা একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, যা নিশ্চিহ্ন ও নিঃশেষ হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল তেঁতুলিয়া নদীর কূল-ভাঙা প্রচণ্ড জোয়ারের তরঙ্গে উম্মাদ স্রোতোধারার সঙ্গে, তাহা কি আবার এমন ভাবে ফিরিয়া দেখা দিতে পারে কোনো উপায়ে, কোনো সম্ভব বা অসম্ভব স্বপ্নেও?

কিন্তু স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, কিছুই নয়। যাহা দেখিবার তাহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অত্যন্ত সত্য এবং বাস্তব এই পৃথিবী। নৌকার নীচে তীক্ষ্ণধারায় খালের জল বহিতেছে—নৌকা দুলিতেছে ক্রমাগত। মশাগুলি কানের কাছে তেমনি

গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। খাল হইতে পচা কচুরি এবং সদ্যোবর্ষণের পর পৃথিবী হইতে পিছল কাদার গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে। মাঝিদের লণ্ঠনের আলোর চারিদিকে একটা প্রায়ান্ধকার অস্পষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে, দারোগা বেদনা-বিমর্ষ মুখে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শিকার জাল হইতে চম্পট দিয়াছে এবং তাঁহার ইন্‌সপেক্টর হইবার সযত্ন-লালিত স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে কৈবল্যধাম লাভ করিয়া বসিয়া আছে।

আর দারোগার টর্চের আলো যাহার মুখে পড়িয়াছে—সে কে, সে কী?

শাদা পাথরে খোদাই করা বুদ্ধমূর্তি। জীবনে কত কীর্তিই সে করিল তাহার শেষ নাই। সে কীর্তির একটা অধ্যায়ের সঙ্গে মণিমোহন নিজেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। সাধারণ দৃষ্টির বিচারে, সমাজের চোখে তাহার স্থান কোথাও নাই। একটা উচ্ছৃঙ্খল বন্য জীবন—একটা আগুনের মতো তীব্র তপ্ত লালসা। কিন্তু এই মুখখানা দেখিলে সে কথা কাহার মনে হইবে? নির্মল, পবিত্র, কোনোখানে মলিনতার একবিন্দু চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে কথা কহিল। বলিল, থাক আলো নিবিয়ে দিন। আমি দেখছি দারোগাবাবু।

মেয়েটি তাহাকে চিনিল কি? তাহার নীলার মতো চোখে পরিচয়ের কোনো আভাস কি ঝলক দিয়া উঠিল? কিন্তু সে সব স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে হইবার আগেই দারোগার টর্চের আলোটা নিবিয়া গেল। শুধু মাঝিদের লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল শিখার যে

রক্তাভাটুকু জাগিয়া রহিল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন কোনো জনহীন নিবিড় বনের মধ্যে শান্ত সমাহিত ভাঙা একটি দেবমূর্তির ওপরে বনের পাতার ফাঁক দিয়া খানিকটা আলোকের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মণিমোহন বলিল, আমি কাল ওর সঙ্গে কথা বলব। আজ থাক। আপনি কি ওকে থানায় নিয়ে যেতে চান?

নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দারোগা যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন না, সে শুধু মণিমোহন সম্মুখে ছিল বলিয়াই। বলিলেন, থানায় নিয়ে যাবো না মানে? চালান দেব। কি আপনি বলেন স্যার? এই বেটিই সব জানে, সব গণ্ডগোলের গোড়াতেই—

—প্রমাণ করতে পারবেন তো?

—নিশ্চয়। সাক্ষীর অভাব হবে না। বলেন কি মশাই, আমার এতদিনের আশা, বুড়োবয়সে কোথায় একটু ভালো রকম পেন্সন পাবো তা নয়—

গলার সুরে মনে হইল যেন কান্না উচ্ছলাইয়া পড়িতেছে।

—বেশ, যা ভালো বোঝেন করুন। তবে আমি একবার কাল আপনার আসামীর সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখব। হয়তো আপনার তাতে সুবিধেই হবে।

—বেশ তো, বেশ তো স্যার। দারোগা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন: তা হলে কালই আপনার কাছে হাজির করব সকালে। কখন নিয়ে যাব? আটটা—নটা?

—আচ্ছা।

# উপনিবেশ

মণিমোহন চোখ বুজিয়া বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল। তাহার আর ভালো লাগিতেছে না, কথা বলিতেও যেন সে শ্রান্তি বোধ করিতেছে।

দারোগা কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, স্যার, বোঝেন তো, আমাদের সবই আপনাদের দয়ার ওপর নির্ভর করছে। দু চারটে কথা যদি বার করে দিতে পারেন, তাহলে কেনা গোলাম হয়ে থাকব। অবশ্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না, তবুও—

—আচ্ছা—আচ্ছা—মণিমোহন যেন ধমক দিল একটু: সে আপনার ভাবতে হবে না। আমি যতটুকু ভালো বুঝি করব।

—না, তাই বলছিলাম আর কি স্যার। আচ্ছা আপনি ঘুমোন—সন্ত্রস্ত দারোগা নৌকা হইতে নামিয়া গেলেন।

রাত্রি শেষ যায়। নৌকা ছাড়িয়া দিল। কালকের মতো আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে অস্ত চাঁদের উপরে, ভোরের দিকে বৃষ্টি নামিবে কিনা কে জানে। নৌকার গায়ে বেত-কাঁটার আঁচড়, দূরে শিয়ালের ডাক—কোথা হইতে হিস্‌হিস্ করিয়া একটানা একটা অদ্ভুত শব্দ। যেন নৌকার আকস্মিক উপদ্রবে বিব্রত হইয়া কতকগুলি সদ্য ঘুমভাঙা সাপ একসঙ্গে ফণা তুলিয়াছে—শত্রুকে ছোবল মারিবে।

মণিমোহন ঘুমাইবার জন্য চোখ বুজিল কিন্তু ঘুম আসিল না। চোখের পাতায় যেন হাজার হাজার পিন ফুটিতেছে—মাথার মধ্যে ফুলঝুরির মতো অবিশ্রান্ত কতকগুলি আগুনের তারা ঝরিয়া চলিয়াছে। কাকে দেখিল সে—কী দেখিল! দশবছর ধরিয়া

যাহার জন্য সে স্বপ্ন রচনা করিয়াছে, অনেক শান্ত কোমল রাত্রে চাঁদ-ডুবিয়া-যাওয়া স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে যখন শুধু দূরের রেল লাইনের কলিকাতাগামী ট্রেনের চাকার তলায় মরানদীর ব্রীজ হইতে ঝমঝম করিয়া একটা অদ্ভুত শব্দ ভাসিয়া আসিয়াছে, আর ঘুমন্ত রাণীর বাহু বন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে বালিশের উপরে উঠিয়া বসিয়াছে—সেই সময় চলন্ত একটা অন্ধকার ট্রেণের জানালা হইতে একখানি উজ্জ্বল সুন্দর আভাসের মতো মনের সামনে প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কাহার মুখ? এবং সেই মুখকে এখানে এইভাবে যে দেখিবে এমন কল্পনা সেকি করিয়াছিল কখনো?

আশ্চর্য মুখখানি। এত ঝড় এত ঝাপটা বহিয়া গেছে। সর্বোপরি বহিয়া গেছে সময়—তেঁতুলিয়ার স্রোতে নতুন ডাঙা, নতুন উপনিবেশ জাগাইয়া তোলা সময়। অথচ সে স্রোত এতটুকুও দাগ কাটে নাই, একটি শামুক ঝিনুকের চলার দাগেও সে মুখ এতটুকু রেখাঙ্কিত হইয়া উঠে নাই। আশ্চর্য!

কাল দেখা হইবে। দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা কি ফিরিয়া আসে? আর কি ফিরিয়া আসে কখনো? জীবনের গতি বৃত্তাকার নয়, কখনো সরল, কখনো সরীসৃপ। সেদিনও মনটা নিজের বাঁধা পথ খুঁজিয়া পায় নাই—মনে রোমান্সের নেশা ছিল—এই নতুন দেশ, অদ্ভুত নদী সেদিন বিচিত্র রোমাঞ্চ কল্পনা আর স্বপ্ন কামনা জাগাইয়া তুলিত। সেদিন আজ আর নাই। সব চেনা হইয়া গেছে, জানা হইয়া গেছে, প্রতিদিনের অতি

পরিচয়ের নেশা কাটিয়া গেছে। দীর্ঘ নদীপথ ক্লান্তিকর মনে হয়, —নতুন জাগা বালির চর দেখিয়া তিনশো বছর আগেকার পর্তু-গীজদের স্বপ্ন ফিরিয়া আসে না—দুপুরের রোদে ঝিকমিক বালির তাপে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

সর্বোপরি রাণী। সেদিনও উজ্জ্বল মন তাকে মানিয়া লয় নাই—

সেদিনের প্রেম ছিল আকারহীন একটা অর্ধতরল পিণ্ডের মতো, যেমন খুশি তাহাকে রূপ দেওয়া চলিত, আকার দেওয়া চলিত। আজ অনেক সূর্যের তাপে সেই তরলটা জমাট বাঁধিয়াছে —জীবনের যাহা কিছু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে সমান একটা কঠিন ভিত্তির উপর। আজ সেখানে আলোড়ন জাগাইতে গেলে ভূমিকম্প ঘটিয়া যাইবে—সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া যাইবে। সে ভাঙন আজ আর মণিমোহন কামনা করে না—সে ভাঙনকে মনের মধ্যে মানিয়া লইবার স্পৃহা বা দুঃসাহস কোনোটাই তাহার নাই। আজ রাণীই ভালো—আজ পিণ্টুর মধ্যেই তাহার ভবিষ্যতের রূপায়ন। তাহার চাকরীর ভবিষ্যৎ একটা স্পষ্ট উজ্জ্বল দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়াইয়া দিয়াছে।

না—দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা আর ফিরবেনা।

* * * * *

কিন্তু সুখ ছিল না বলরাম ভিষক্‌রত্নের। ভগবান তাঁহার কপালে একবিন্দু সুখ লেখেন নাই, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেই কি আর তাহাতে এক বিন্দু সুবিধা হইবে।

মনে মনে ডি-সিল্‌ভা আর ক্রুজার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে বলরাম ফিরিলেন। জননী মেরীর এত দয়া, আর এই সন্তানগুলিকে তিনি কি মর্ত্যলোক হইতে তুলিয়া তাঁহার স্নেহময় স্বর্গীয় কোলে স্থান দিতে পারেন না? তাহা হইলে পৃথিবীর না হোক, অন্তত বলরামের ভাজা-ভাজা হাড়গুলি তো জুড়াইয়া যায়।

রাধানাথ তাঁহার খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া ঘুমাইতেছে। পড়িয়াছে কুম্ভকর্ণের মতো, কাণের কাছে এখন তাহার প্রবল বেগে কাড়া-নাকাড়া বাজাইলেও সে ট্যাঁফোঁ করিবে না। বলরামের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় সে নিরিবিলিতে এবং নিভৃতে তাঁহার মদনানন্দ মোদক কিছু কিছু উদরস্থ করিয়া থাকে।

হাত পা ধুইয়া বলরাম খাইতে বসিলেন। রাত্রে তিনি ভাত খান না—খান সামান্ত রুটি আর তরকারী। কিন্তু রুটি মুখে দিয়াই মনে হইল, ইহার চাইতে জুতোর শুকতলা চিবাইয়া হজম করা সহজ। টানের চোটে মুখের বাঁধানো গোটাকয়েক দাঁত একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিবার বাসনা করিল।

—ছুত্তোর—

জোর করিয়া কয়েক টুকরা রুটি দাঁতে ছিঁড়িয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। হতভাগা দিনের পর দিন কী রান্নাই যে রাঁধিতেছে আজকাল। গৃহিণীহীন সংসারের চিরকাল যা হইয়া থাকে ঠিক তাই, এ জন্ত আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, রাগ করাটাও সমান মূল্যহীন এবং অবান্তর।

কিন্তু দোষ শুধু রাধানাথেরই নয়। সাবাস একখানা বুক

বাধিয়াছে বটে। মানুষকে একেবারে বেহদ্দ করিল, ত্রিভুবন দেখাইয়া ছাড়িল বলিলেই চলে। ধান-চালের যাহা হইবার তাহা তো ষোলো আনাই হইয়াছে, আর আটা যা আমদানি হইতেছে ইদানিং তাহার তুলনা ভূ-ভারতে কোথাও মিলিবে না। করাতের গুঁড়া এবং ধানের তুঁষ মিলাইয়া যে কোনোদিন আটা নামক একটি খাদ্য হইয়া উঠিতে পারে, আর তাহা মানুষের পেটে ঢুকিয়া তাহার ক্ষুধা দূর করিতে পারে, কবিরাজী শাস্ত্রের কোনো পুঁথিতেই তাহার উল্লেখ নাই। এ কী ব্যাপার এবং কী বস্তু?

বলরাম নিজেই উঠিয়া গড়গড়াটা ধরাইলেন। তারপর আসিয়া বসিলেন বাহিরের ঘরটাতে। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটাও আজকাল অত্যন্ত হালকা হইয়া উঠিয়াছে। ছানী কাটানো চোখ দুইটা মাঝে মাঝে জ্বালা করে, এক একদিন মাথার মধ্যে রক্ত চড়িয়া যায়, কপালের দু'পাশের রগগুলি রক্তের চাঞ্চল্যে লাফাইতে থাকে—ঘুম আসে না। আজও ঘুম আসিবে বলিয়া মনে হয় না। বলরাম বসিয়া বসিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

কিছু কিছু মশার উপদ্রব বোধ হইতেছিল, দুহাতে সেগুলি মারিতে মারিতে কখন যে তন্দ্রার আবেগ আসিয়াছে বলরাম ভালো করিয়া তাহা টের পান নাই। অস্পষ্ট হইয়া আসা চেতনার মধ্যে তিনি দেখিতেছিলেন—ডি-সিল্‌ভা মেজের উপরে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, দুর্গন্ধ বমিতে তাহার সর্বাঙ্গ ভাসিয়া গেছে, আর—

কড়াং—কড়াং—

দরজার কড়া নড়িল। কড়—কড়াং—

তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তাকিয়ার পিঠ খাড়া করিয়া ক্রুদ্ধ বিরক্ত বলরাম উঠিয়া বসিলেন—আঃ, এই রাত্রে আবার জ্বালাইতে আসিল কে? অসুখ বিসুখ কী দিনই যে পাইয়াছে—রোগীদের অত্যাচারেই এবারে বলরামকে চর ইস্‌মাইল ছাড়িয়া তল্পী-তল্পা গুটাইতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ডাক্তারখানার শিশিতে তো খানিকটা লাল-নীল জল, অতএব—

কিন্তু দরজায় কড়া নাড়িতেছে অধৈর্যভাবে।—কে?

কোনো সাড়া আসিল না।

—কে ডাকে এখন?

তবুও সাড়া নাই। সহসা একটা আশঙ্কায় বলরামের মন ভরিয়া গেল। চারদিকে যে একটা অশান্তি এবং বিক্ষোভের চাপা আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। ধান নাই, চাল নাই। চর ইস্‌মাইলের মানুষগুলির রক্তে বিদ্রোহ জাগিতেছে। তাহারা এখানে ওখানে জমায়েত করিয়া স্থির করিয়াছে যেমনভাবে হোক ধান চাল সংগ্রহ করিবেই। মহাজনের গোলা কিম্বা আড়তদারের গুদাম—দরকার হইলে লুট তরাজ করিয়া লইতেও তাহাদের আপত্তি নাই। তাহাদের লক্ষ্য বস্তুর ভিতরে তিনিও যে একজন আছেন, একথাও বলরাম ভালো করিয়াই জানেন।

সুতরাং আতঙ্কে তাঁহার বুকের ভেতরটা বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। উঠিয়া দরজা যে খুলিয়া দিবেন এমন শক্তি

রহিল না, শুধু বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দুর্গানাম জপ করিয়া চলিলেন।

কিন্তু কড়—কড়াং! কড়—কড়—কড়াং—

কড়া নাড়া চলিতেছে তো চলিতেছেই। বলরাম কান পাতিয়া শব্দটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। যে নাড়িতেছে সে খানিকটা সংশয়গ্রস্ত এবং ভীত। খুব সম্ভব ডি-ক্রুজা বলিয়া মনে হইতেছে! তবু বিশ্বাস নাই—সাড়া দেয় না কেন?

মরিয়া হইয়া বলরাম হাঁকিলেন: কে?

একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন পাওয়া গেল। কিন্তু কী শব্দ? বলরাম কাণ পাতিলেন। একটা চাপা কান্না—কেউ যেন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নাই, কান্নার শব্দই বটে। কিন্তু কার কান্না, কিসের কান্না?

আর বসিয়া থাকা অসম্ভব।

—দাঁড়াও—দাঁড়াও—খুলছি—মরিয়া হইয়া একটা হাঁক দিয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। যা হওয়ার হোক। এই অশ্রান্ত কড়া নাড়া, রহস্যময় নীরবতার সঙ্গে কান্নার শব্দটা তাঁহাকে পাগল করিয়া দিতেছে। বলরাম আলোটার তেজ বাড়াইয়া দিলেন, তারপরে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া দ্বিধা কম্পিত হাতে দরজার হুড়কাটা টানিয়া খুলিয়া দিলেন। কে জানে, কোন্ ভয়ানক একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

কিন্তু বাস্তবিকই একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যাহা ঘটিল অন্তত সে সম্ভাবনার জন্য মনের দিক হইতে তিনি এতটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাকে নির্বাক স্থবির করিয়া দিয়া একটি লোক ছুটিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। কিন্তু সে কী এবং কে বলরাম বুঝিতে পারিলেন না।

তাহার সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢাকা। সেই বোরখার এখানে ওখানে কাঁচা রক্ত চাপ বাঁধিয়া আছে! ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া সে মাতালের মতো টলিতেছে।

ব্যাপার কী? ভৌতিক ঘটনা নাকি? না বলরাম ঘুমাইয়া আছেন এখনো?

কিন্তু বোরখায় ঢাকা রহস্যময় মূর্তিটি তাঁহার সামনেই তো দাঁড়াইয়া আছে। রক্তের দাগগুলি সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশই নাই। হায় ভগবান—একি সমস্যার মধ্যে তুমি নিরীহ গোবেচারী বলরাম ভিষকরত্নকে টানিয়া আনিলে! শেষ পর্যন্ত খুনের মামলায় পড়িবেন নাকি তিনি?

—তুমি কে—কী চাও?

উত্তরে তেমনি বোরখার ভিতর হইতে চাপা কান্নার শব্দ। একটি মেয়ে—মুসলমানের মেয়ে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

বলরামের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া গেল। সমস্ত চৈতন্য সহ্যের শক্তিতে অতিক্রম করিয়া গেছে। পাগলের মতো তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন: কে তুমি, কী চাও?

মেয়েটি এবারেও জবাব দিল না। তখনই সোজা একেবারে বলরামের পায়ের উপরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত বলরাম থ হইয়া রহিলেন। তারপর কী ভাবিয়া মেয়েটির মুখের উপর দিয়া টানিয়া বোরখাটা সরাইয়া লইলেন।

গাল কপাল দিয়া রক্ত গড়াইয়া নামিয়াছে—একখানা সুন্দর মুখ সেই রক্ত মাখিয়া একটি পদ্মের মতো পড়িয়া আছে। অজ্ঞান হইয়া গেছে মেয়েটি, দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে—বুকের ভিতর হইতে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন পাঁজর ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

দশ বছর পার হইয়া গেছে। তবু লণ্ঠনের আলোয় বলরাম তাহাকে চিনিলেন। শিরায় শিরায় রক্তে মাংসে কামনা কল্পনায় যে এতদিন ধরিয়া এমনভাবে একান্ত হইয়া আছে তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া কি এতই সহজ। শুধু দশ বছর কেন, একশো বছরের বেশি হইয়া গেলেও বলরাম তাহাকে চিনিতে পারিতেন।

রক্তমাখা রক্তপদ্মের মতো যাহার মুখখানি সেই মেয়েটি মুক্তো। দশ বছর আগে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তেমনি না বলিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে।

## এগারো

কিছুক্ষণ বলরাম কোনো কথাই কহিতে পারিলেন না। যেন কী একটা যাদুমন্ত্রে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সুরু করিয়া জিহ্বা পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেছে। একি কখনো সম্ভব, এমন কি হইতে পারে কোনোদিন? ডি-সিল্‌ভার ঘর হইতে সেই উগ্র মদের গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও কি মাতাল এবং বিহ্বল করিয়া দিয়াছে?

বলরাম দাঁড়াইয়া রহিলেন। পা কাঁপিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে—বুকের দুদিক হইতে দুইটা প্রাণপিণ্ড ছুটিয়া আসিয়া যেন একসঙ্গে ঠোকাঠুকি করিতেছে। কিন্তু বিহ্বল নির্বোধ হইয়াও বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না তিনি। পায়ের নীচে ঐ রক্তাক্ত দেহটা নড়িতেছে—ঢেউয়ের মতো নিশ্বাস পড়িতেছে। বলরামের মনে পড়িল এমনিভাবে আর একবার তিনি টর্চের আলো ফেলিয়া দেখিয়াছিলেন: সিঁড়ির নীচে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে একটি নারীমূর্তি, গলগল করিয়া তাজা রক্তের ধারা নামিয়া তাহার সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিতেছে। সে দশ বৎসর আগেকের কথা, আর আজ—

পায়ের তলায় পড়িয়া গোঙাইতেছে মুক্তো। মুক্তো—দশবছর আগে একদিন যে বলরামের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল

—যাহার বুকের মধ্যে অসহায় মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া তিনি শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িতেন—তাঁহার সেই মুক্তো! মুহূর্তে যেন বিদ্যুতের চমকে বলরামের সর্বাঙ্গ নড়িয়া উঠিল।

—রাধানাথ, জল আন্, জল—

*　*　*　*　*

মণিমোহনের বোট যখন চর ইস্‌মাইলে বাংলোর ঘাটে আসিল, তখন রাত্রির শেষ প্রহর। ঝিমঝিম ঝিরঝির করিয়া সেতারের একটানা সুরের মতো যে বৃষ্টিধারাটা ঝরিয়া পড়িতেছিল, সেটা থামিয়া গেছে ঘণ্টাখানেক আগে। বৃষ্টির জলে উজ্জ্বল হইয়া অস্ত-পথিক নক্ষত্র-চক্র আসন্ন-প্রভাত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আছে শান্ত আর কোমল দৃষ্টিতে। ব্যাঙের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-গান উঠিতেছে, ঝোপের মধ্যে পোকা ডাকিতেছে। কোথা হইতে বাসা-ভাঙা একটা কাক থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—যেমন আর্ত, তেমনই করুণ তাহার অসহায় স্বর।

মণিমোহনের সমস্ত চৈতন্যটা আগুনের মতো জ্বলিতেছে। দৃষ্টির সামনে অগ্নিশিখার মতো প্রখর ও ভাস্বর হইয়া শোভা পাইতেছে একখানা জীবন্ত বুদ্ধমূর্তি। সে মূর্তির চোখে দুইখানি নীলা বসানো। তাহা উপনিবেশের কোনো কালবৈশাখীতে ঝড়ের পিঙ্গল আলোয় দীপ্তি বিচ্ছুরণ করিতে থাকে, তাহার পশ্চাতে কামনার শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র একখানা ছোরা ঝলক লাগাইয়া যায়।

নৌকার মাঝি ঝপ করিয়া লগিটাকে ফেলিল। জল-কাদার

মধ্য হইতে আকস্মিক শব্দ উঠিল একটা, যেন শেষ-রাত্রির রহস্যময়ী নদীটা সেই বর্মী মেয়ে মা-ফুনের মতো একটা কৌতুকের আনন্দে খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাঝি বলিল, হুজুর, উঠবেন না ?

মণিমোহন জবাব দিল, নাঃ থাক। এত রাত্রে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘণ্টা তিনেক রাত আছে, নৌকোতেই ঘুম দিয়ে নেব এখন।

—সে কি হুজুর, কষ্ট হবে যে। ভালো বিছানা নেই, কিছু নেই—

—তা হোক, তা হোক।

মাঝিরা আর কথা কহিল না। হাকিমের মর্জির উপরে বলিবার কথা কিছুই তাহাদের নাই। মাল্‌সা হইতে আগুন লইয়া তাহারা হুঁকা ধরাইয়া আরাম করিয়া বসিল, দশ পনেরো মিনিট ধরিয়া তামাক টানিল, মণিমোহনের দুর্বোধ্য চট্টগ্রামের ভাষায় খানিকক্ষণ কী গল্প করিল, তারপর এক একখানা কাপড় মুড়ি দিয়া যে যেথান পারিল গুঁটিশুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। আর শোয়া মানেই ঘুমাইয়া পড়িতে যা দেরী।

নদীর বুক হইতে শেষ রাত্রির হাওয়া নৌকার এখান ওখান দিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। সকলের মধ্যেও অল্প অল্প শীতের শিহরণ লাগিতেছে মণিমোহনের। তবে এ ঠাণ্ডাটা পীড়াদায়ক নয়— শরীরের ভিতর কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে মাত্র।

ইচ্ছা করিয়াই রাতটা সে বোটে আটকাইয়া দিতে চায়। আজ দশবৎসরের পরে বর্মী মেয়েকে দেখিয়া তাহার সমস্ত চিন্তা-চেতনাই যেন বিচিত্রভাবে বিশৃঙ্খল হইয়া গেছে। ঠিক সেই সব দিন যেন রক্তের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে—যে-সব দিনে তাহার রক্তে প্রবেশ করিয়াছিল উপনিবেশের নির্মম রুদ্র-বসন্ত, উন্মত্ত বর্বর যৌবন। বাহিরের গর্জন-মুখর অকাল-অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দুইটি দেহের অণুতে অণুতে মশাল জ্বলিতেছিল, রাণীর মুখখানা ছায়াছবি হইয়া মিলাইয়া গিয়াছিল দৃষ্টির বাহিরে।

গায়ের মধ্যে জ্বালা করিতেছে, মাথাটা যেমন ভারী, তেমনি গরম হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহন উঠিয়া বসিল। তাহার আবার নেশা ধরিতেছে নাকি? কাল দারোগা মেয়েটাকে লইয়া আসিবেন নিশ্চয়। সে কী বলিবে কে জানে!

কী বলিবে!

হঠাৎ মণিমোহনের চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

এ সে করিতেছে কী! সে কী পাগল হইয়া গেল? ওই অসচ্চরিত্র একটা মগের মেয়ে, নিজের স্বামীকে যে ইচ্ছা হইলেই খুন করিতে পারে, কামনার তাগিদে যে-কোনো লোককে আত্ম-সমর্পণ করিতে যাহার বাধা নাই এবং যে একসময় মণিমোহনকে নির্বোধের মতো নাকি দড়ি দিয়া নাচাইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সে আবার কথা কহিতে চায় কোন্ সাহসে এবং কোন্ লজ্জায়!

বর্মী মেয়েকে তো বিশ্বাস নাই। সেদিন যে ঝড়ের সন্ধ্যা

তাহার জীবনে আসিয়াছিল, মণিমোহনের কাছে সেই বিস্ময়কর ভয়ানক মুহূর্তটির মূল্য যাহাই থাক, এ মেয়েটার কাছে তাহার দাম কতটুকু! ইহার এইই তো পেশা—যখন যাকে পায় কাছে টানিয়া লয়, দুদিনের জন্য তাহাকে মদের নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তারপর একটা ভাঙা-পুতুলের মতো ফেলিয়া চলিয়া যায়। মণিমোহনও একদিন তাহার পুতুল খেলার সঙ্গী হইয়াছিল—তাহারা বেশি কিছুই নয়।

মনে করো—কাল মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া বসিল, একদিন মণিমোহনের সঙ্গে তাহার একটা অশোভন সম্পর্ক ছিল, একদিন মণিমোহন—

কথাটা ভাবিতেই অন্তরাত্মা তাহার চমক খাইয়া উঠিল। কী সর্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টির সামনে কতখানি নামিয়া যাইবে সে! দারোগা জানিবেন, চর ইস্‌মাইলের সবাই জানিবে, রাণী জানিবে, কে জানিবে এবং কে জানিবে না! আর ব্যাপারটা হয়তো ওখানেই শেষ হইবে না, প্রাদ্ধ আদালত পর্যন্তও হয়তো গড়াইবে এবং ওই নির্লজ্জ—ওই ভয়ঙ্কর নীলার মতো জলন্ত দুইটি শাণিত-নয়না মেয়েটি আদালতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বসিবে—

তাহা হইলে? মণিমোহনের আচ্ছন্ন সত্তার মধ্যে বাস্তব পৃথিবীর তীব্র রূঢ় আলো আসিয়া পড়িল। দশ বছর আগে যাহা ঘটিয়াছিল আজ আর তাহা সত্য নাই—আজ আর সত্য হইতে পারে না। সেদিন দায়িত্ব ছিল না—জীবনের কোনো পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ রূপ ছিল না, শুধু রোমান্স্ ছিল, শুধু উদগ্র খানিকটা

মাদকতা ছিং।[illegible]াইয়া মরিবে না—যা হয় একটা কিছু কি হইয়াছে, সরকারী চাকরীর ক্রমোন্নতির পথ ধ।নয়া চ।লয়াছে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব সম্ভাবনার দিকে। রাণীকে সে ভালোবাসে, পিণ্টুর মধ্য দিয়া তাহার নিজের মৃত্যুহীন প্রাণ-প্রবাহকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। খ্যাতি, অর্থ ও আরাম। অফিসে আদালতে দশ বছর আগেকার এই কেলেঙ্কারীটা জানাজানি হইলে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না, রাণীর কানে গেলে যেমন দুর্বহ, তেমনই বিড়ম্বিত হইয়া উঠিবে সমস্ত পারিবারিক জীবনটা। তাহার চাইতে—

কাল দারোগা আসিবার আগেই সে পালাইবে। পালাইবে এই চর ইস্মাইল হইতে। আগষ্ট আন্দোলনের ফেরারী ধরা তাহার দায়িত্ব নয়, ওসম্বন্ধে মামুদপুরের দারোগা যাহা ভালো বোঝেন করিবেন। যে কাজে সে এখানে আসিয়াছিল, তাহা একরকম শেষ হইয়াছে, যাহা হয় নাই, তাহা সদর অফিসে ফিরিয়া গিয়া কাগজপত্র মারফৎ সারিয়া দিলেই চলিবে।

সে পালাইবে। আজ তাহার জীবন বদলাইয়াছে, তাহার যৌবন নাই। চর ইস্মাইলকে সে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না, মানিয়া নিতে পারে না কাল-বৈশাখীর তরঙ্গ-তাণ্ডবে উন্মত্ত এই ভয়ানক নদীর দিগন্ত-বিস্তারকে, এখানকার বর্বর প্রাণোল্লাসকে। আজ তাহার মনের মধ্যে একদিকে দেখা দিতেছে লাল-কাঁকর ফেলা সেই ছোট প্ল্যাটফর্ম, বাতাসে ভাঁটফুল আর আমের মুকুলের গন্ধ, পারুল-বনের মধ্যে প্রেমদাস বৈরাগীর

হার জীবনে আসিয়াছিল, মণিমোহনের কাছে সেই একতান। আর এক।দকে রাত্রির অপ্সরী কলিকাতা—ফ্লাওয়ার মার্কেট, মেট্রো সিনেমা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের গা হইতে পাউডারের গন্ধ; আর অফিসারদের ক্লাবে বিলিয়ার্ড টেবিলে ষ্টিকের শব্দ, তকমা-আঁটা বেয়ারার হাতে রূপার ট্রেতে বিলাতী মদের পাত্র। ঘরে রেডিয়ো খুলিয়া বসিয়া আছে রাণী, পিণ্টু তাহার খেলার মোটর লইয়া পিয়াজীর সঙ্গে অকারণ কলহাসিতে সমস্ত বারান্দাটা মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

নাঃ—সে পালাইবে। কাল সকালেই এবং যেমন করিয়া হোক। যৌবনের আত্মবিস্মৃত একটি বিহ্বল তরুণের সঙ্গে আজকের হাকিম মণিমোহনের কোনো মিল নাই, কোনো মিল থাকা অসম্ভব।

*     *     *     *     *

ওদিকে কালুপাড়ার দিক হইতে জনতার উত্তাল তরঙ্গ চর ইস্‌মাইলের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মজাঃফর মিঞার গোলা পোড়াইয়া দিয়া তাহাদের রক্তেও আগুন ধরিয়াছে। এতদিন ধরিয়া যে ভয় এবং দ্বিধার ভার তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছিল, সেটা সরিয়া গেছে। এখন তাহাদের ভয় নাই, সংশয় নাই; যুদ্ধ এবং মহাজনের পীড়নে যে জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল—তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে উপনিবেশের অমার্জিত উদ্বেল শক্তি। মরিতে যদি হয় তো সোজা

দাঁড়াইয়া' দাঁড়াইয়া মরিবে না—যা হয় একটা কিছু করিয়া তবে ছাড়িবে।

সারা রাত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি—বাদলের দমকা বাতাস বহিতেছে। তাহারই মধ্যে, সেই জল বাতাস মাথায় করিয়া তাহারা মস্‌জিদের মাঠে সভা করিল। মহাজনদের সকলকে দেখিয়া লইতে হইবে। চাল না পাওয়া যায়, তাহারা যেমন করিয়া হোক আদায় করিয়া লইবে। দিনের পর দিন এই যে একটা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, গায়ে রক্ত থাকিতে, হাতে লাঠি থাকিতে তাহারা কিছুতেই সেটা মানিয়া লইবে না।

সভায় জোর গলায় বক্তৃতা দিল জমির।

—ভাই সব, নিজের বরাত নিজের হাতে। কুকুরের মতো না খেয়ে মরব কেন আমরা? চলে এসো, যে ব্যবস্থা পারি আমরাই করব। আমরা জোয়ান—মরি তো লড়াই করে মরব—মেয়েমানুষের মতো কেঁদে মরব কেন।

—আল্লা হু আকবর—

ভোরের অন্ধকার ফিকে হইবার আগেই পাঁচশো লাঠিয়াল অগ্রসর হইল চর ইস্‌মাইলের দিকে। মামুদপুরের বনোয়ারী দারোগা তখন সুখ-শয্যায় পড়িয়া অচির-ভবিষ্যতে ইন্‌সপেক্টার হইবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন।

মণিমোহন বলিয়াছিল, রাণী, আজই সদরে ফিরতে হবে—এখনি। খুব জরুরি দরকার, খবর পেলাম।

ঘাটে বোট তৈরী হইতেছে। জিনিসপত্র সব তোলা হইয়া গেল। রাণীর শরীরটা এখনো দুর্বল—বোটের মধ্যে বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে। পিণ্টু মায়ের কাছে বসিয়া একমনে চকোলেট চুষিতেছে, পিয়ারী মাঝিদের ধমক দিয়া নিজের পদ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

মণিমোহন পালাইতেছে। দারোগা আসিয়া কী ভাবিবেন কে জানে। কিন্তু সে কথা ভাবিলে মণিমোহনের চলিবে না। যাহা নিশ্চয় আর নির্ধারিত হইয়া গেছে—সেখানে নতুন করিয়া ঝড় আনিতে আর সে চায় না। জীবন্ত-বুদ্ধমূর্তির মতো চোখ দুটির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইতে আজ আর তাহার সাহস নাই।

ঠিক এমনি সময় আর একখানা নৌকা আসিয়া পাশে লাগিল। মণিমোহন চাহিয়া দেখিল, সামনে গলুইয়ে কবিরাজ বসিয়া।

—এ কি, কবিরাজমশাই যে।

কবিরাজ ম্লানভাবে হাসিলেন।

—কোথায় চললেন?

—শহরে।

—নৌকোর ভেতরে কে?

কবিরাজ মুহূর্তে কেমন হইয়া গেলেন, পরক্ষণেই তাঁহার মুখ কঠিন ও দৃঢ় হইয়া উঠিল। স্থির শান্ত গলায় বলরাম জবাব দিলেন: আমার স্ত্রী।

দশবছর আগেকার কথা ভুলিয়া গেছে মণিমোহন। শুধু বলিল, আপনার স্ত্রী? ওঃ!

মণিমোহনের মাঝিরা নৌকার নোঙর তুলিয়াছে। পাঁচ পীর বদর—বদর। সামনে সকালের নদী শান্ত ও উজ্জ্বল বিস্তারে যেন ঘুমাইয়া আছে। ঝড়ের গর্জন নয়—রাক্ষসী ভৈরবীমূর্তিও নয়। জলের মৃদু কলধ্বনি যেন সঙ্গীতের মতো বাজিতেছে। ওপারে দিক্‌চক্রবালে শ্যামল বনরেখার ধূ ধূ আভাস দেখা যাইতেছে—মাথার উপর নির্ভাবনায় উড়িয়া চলিয়াছে মাছরাঙা আর গাং শালিকের ঝাঁক।

মণিমোহন বলিলেন, আচ্ছা কবিরাজমশাই, নমস্কার।

—নমস্কার।

ভাঁটার প্রখরটানে সরকারী বোটখানা ভাসিয়া গেল।

বলরামের নৌকাও এখনি ছাড়িবে। মাঝিরা বেশ করিয়া তামাক টানিয়া লইতেছে—অনেকখানি পথ পাড়ি জমাইতে হইবে। বলরাম অন্যমনস্কের মতো বিড়ি ধরাইলেন।

মুক্তোর সর্বাঙ্গে গভীর ক্ষত। বেশ বোঝা যায়, ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়া তাহাকে কোপাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার জ্ঞান এখনো ফেরে নাই, শহরে গিয়া ফিরিবে কি না কে জানে। বোধ হয় সম্পত্তির গোলমালেই মুরুল গাজীর সুযোগ্য পুত্রেরা তাহার এই অবস্থা করিয়া ছাড়িয়াছে।

কিন্তু ওসব ভাবিবার দরকার তাঁহার নাই। আজ মুক্তো তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে—আজ আবার তাহাকে তিনি গ্রহণ করিবেন। এই চর ইস্‌মাইলে যেখানে সমাজ নাই, মানুষের বাঁধাধরা নিয়মের দোহাই মানিয়া যেখানে জীবন সরল-

রেখাতেই বহিয়া যায় না—সেখানে মুক্তোকে নতুন করিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই, সংশয়ও নাই। তাই বোরখা খুলিয়া তিনি তাহাকে শাড়ী পড়াইয়া দিয়াছেন—দশবছর আগেকার তুলিয়া রাখা অতি-যত্নের ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীখানা। শহরে গিয়া মুক্তো যদি বাঁচে, তাহা হইলে এই শাড়ী পরাইয়া মুক্তোকে তিনি নতুন করিয়া ঘরে তুলিবেন, নতুন করিয়াই তাঁহার মিলন-বাসর রচনা হইবে।

মুক্তো ঘুমাইয়া আছে। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নাই, পরম নিশ্চিন্ত, পরম আশ্বস্ত। যেন সারা রাত ঝড়ের মধ্যে ঘুরিয়া ক্লান্ত ভীত একটা পাখী নীড়ে আসিয়া তাহার আপনার জনের বুকের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। বলরাম নাড়ী দেখিলেন। দুর্বল, কিন্তু স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত আশঙ্কার কারণ নাই।

মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে পাগলের মতো রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

—বাবু, বাবু, সর্বনাশ।

—কী হয়েছে?

—পাঁচশো লোক এসে চড়াও হয়েছে—ধান লুঠ করে নিয়ে গেল। এখানে ওখানে আগুন জালিয়ে দিচ্ছে—সব যে গেল!

—যাক।

—সে কি! আমি কী করব বাবু?

—যা খুশি। মাঝি, নৌকো খোলো।

চর ইস্‌মাইলে বলরামের আর আকর্ষণ নাই। যদি কখনো

ইচ্ছা হয় ফিরিবেন, নতুবা নয়। যাক—সব যাক। আজ মুক্তোকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, সব পূর্ণ হইয়া গেছে। চর ইস্মাইলেনা হোক—এত বড় পৃথিবী, এত বিরাট, এর কোথাও কি তাঁহারা স্থান করিয়া নিতে পারিবেন না? সারা জীবন ঘর বাঁধিবার যে ব্যর্থ বাসনা লইয়া তিনি শুধু বিষয়-সম্পত্তির মূল্যহীন বোঝাটাকেই টানিয়া চলিয়াছেন—আজ সেই বোঝা নামাইয়া দিয়া একটি প্রেমকেই তিনি স্বীকার করিতে চান।

রাধানাথ কথা কহিল না। সে শুধু বালির উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * * *

চর ইস্মাইলের দুরন্ত যৌবন জাগিয়াছে। নতুন কালে, নতুন রূপে। ইহার কাছ হইতে মনিমোহনেরা পালাইতে চায়, বলরামেরা ইহার বিচিত্র বিপুল সংঘাতকে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে কতটুকু ক্ষতি। মৃত্যুঞ্জয় অমার্জিত মানবসত্তা এখানে নিঃশব্দ ও নিভৃত আয়োজনে দিনের পর দিন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে নিজেকে। এই বিশাল-ব্যাপ্ত জলরাশি হইতে—এই ঝড়ের আকাশ হইতে—বিলুপ্ত পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভাঙা পঞ্জর হইতে—এখানকার অসংযত আরণ্য-কামনা হইতে। সে দিন হয়তো দূরে নয়—যেদিন এখান হইতেই নিজেকে প্রকাশিত করিবে বাংলার গণশক্তি—বাংলার প্রচণ্ড ও বিপুল প্রাণশক্তি।

উপনিবেশ

সে ইতিহাস—দৈনন্দিন, সে ইতিহাস—ধারাবাহিক। তাহার সমাপ্তি নাই, উপসংহারও নাই। আজ উপনিবেশ হইতে চারশো মাইল দূরে বসিয়া সে অনাগত বিপুল কাহিনীর আমি ভূমিকা মাত্র রচনা করিয়া গেলাম, নতুন যুগের নতুন মানুষ আসিয়া তাহাকে সমাপ্ত করিবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা